এখন ডুয়ার্স

১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭। ১২ টাকা

বন্ধ চা-বাগানের দুরবস্থা

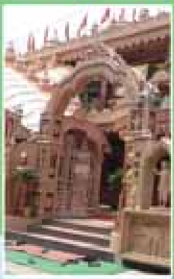

কতটা দায়ী রাজ্য সরকার?

ডুয়ার্সের গ্রামীণ ঐতিহ্য খড়ের ঘর বিলুপ্তির পথে

মালবাজারের নতুন আকর্ষণ বালাজি মন্দির

facebook.com/ekhondooars নিয়মিত পাঠক হলে নাম ও নম্বর পাঠান 9830410808

পায়ে পায়ে পুরুলিয়ায়

টুসু পরবের দেশ পুরুলিয়া। বছরের ওই সময়ে গোটা জেলা আনন্দে রঙিন হয়ে ওঠে। বাড়িতে বাড়িতে দেওয়ালে লাগে নতুন রঙের পরত, মানুষের মনেও লাগে উৎসবের ছোঁয়া। ছৌ নাচের ছন্দে মেতে ওঠে পুরুলিয়া। আর কংসাবতী নদীর ধার ঘেঁষে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা লাল পাথুরে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে পুরুলিয়া আপনাকে আপন করে নেবেই।

EXPERIENCE Bengal

THE SWEETEST PART OF INDIA

DEPARTMENT OF TOURISM, GOVERNMENT OF WEST BENGAL

www.wbtourism.gov.in/www.wbtdc.gov.in www.facebook.com/tourismwb
www.twitter.com/TourismBengal (033) 2243 6440, 2248 8271

Download our app Google play

কফি হাউস ? ক্লাবঘর ? নাকি আরও অনেক কিছু ?

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল একটি বছর।

১লা মার্চ, ২০১৭ থেকে একেবারে নতুন মেজাজে

চা-টা। আড্ডা। দাবা-লুডো-ক্যারাম। পার্টি। গেট টুগেদার। সেমিনার।

বেড়াতে যাওয়ার বইপত্র ও বুকিং।

সোম-শুক্র বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা

শনি-রবি বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

পরিচালনায় NEST SOCIETY (Regn. No. S/2L/5822 of 2013-14)

আড্ডাঘর

মুক্তা ভবনের দোতলায়, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি - ৭৩৫১০১

ফোন - ০৩৫৬১-২২২১১৭

সকলের জন্য **'আড্ডাবাজ'**। মহিলাদের জন্য **'শ্রীমতি ডুয়ার্স ক্লাব'**। তরুণ-তরুণীদের **'ইয়াং ডুয়ার্স'**।

যে কেউ সদস্য হতে পারেন। যে কেউ যোগ দিতে পারেন।

সদস্যদের জন্য 'এখন ডুয়ার্স' বিনামূল্যে !

তৃতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা (অন্তর্বর্তী সংস্করণ),
১৬-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

এই সংখ্যায়

সম্পাদকের ডুয়ার্স
ছাত্র রাজনীতির মুষলপর্ব শেষ অঙ্কে! ৪

পাঠকের কলম
বন্ধ চা-বাগানের দুরবস্থা
কতটা দায়ী রাজ্য সরকার? ৮

ডুয়ার্সের গ্রামীণ ঐতিহ্য
খড়ের ঘর বিলুপ্তির পথে ১৩

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের পাত্রী চাই ২৪

পর্যটনের ডুয়ার্স
মালবাজারের বালাজি মন্দির ২২

পর্যটকের পঞ্চনামা
অচিন মানচিত্র ও তিন নদী ২০

ডুয়ার্সের ডায়েরি
ডুয়ার্সের নাট্যচর্চা হোঁচট খেল ৩৬

নিয়মিত বিভাগ
সংঘ-সংস্কৃতির ডুয়ার্স ৩৮
বইপত্রের ডুয়ার্স ২৯
খুচরো ডুয়ার্স ৬
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস ৪৩

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
লাল চন্দন নীল ছবি ৩১
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ১৬
তরাই উৎরাই ৩৪

শ্রীমতী ডুয়ার্স
আজকের শ্রীমতী ২৬
ডুয়ার্সের ডিশ ২৭

প্রচ্ছদের ছবি ধুপঝোরা সাউথ পার্ক,
তুলেছেন সাত্যকি বিশ্বাস

ভুল সংশোধন

ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৭ সংখ্যায় ভুলবশত 'প্রচ্ছদের ছবি নীলাঞ্জনা সিনহা', ২২ পাতায় গজলডোবা পাখিদের ছবি অতনু সরখেল-এর নাম ছাপা হয়নি এবং ৩৯ পাতায় প্রতিবেদকের নাম পিনাকী মুখোপাধ্যায় ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদকের ডুয়ার্স

ছাত্র রাজনীতির মুষলপর্ব শেষ অঙ্কে!

ঈশ্বর নাকি অনেকদিন একা থাকার পর বোর হয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের রাজ্যেও এমন নাকি শোনা যায় যে, শাসক ছাড়া দ্বিতীয় কোনও দলই নেই। ছাত্র রাজনীতিতেও তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বেবাক কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ছাড়া আর কিছু নেই! থাকবেও বা কীভাবে? উন্নতির জোয়ারে সবাই ভেসে গিয়েছে না! ফলে, কলেজ জুড়ে কেবল টিএমসিপি একা, একক, একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই অসহনীয় একাকিত্ব, যা ঈশ্বরকেও বোর করে দেয়, সহ্য করতে না পেরে অতঃপর তারা সৃষ্টি করেছে সেমসাইড প্রতিপক্ষ। নিজের দলের কাউকে কাউকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিয়ে ছায়ার সঙ্গে অনুপম কুস্তি লড়ে যাওয়ার এই অভূতপূর্ব নীতির কারণে বঙ্গীয় ছাত্র রাজনীতির মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে টিএমসিপি-র আত্মঘাতী বাহিনী।

একটাই দল এবং সেই দলের মধ্যেই লড়াই— এমনধারা ব্যাপার চিন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে কি না, গবেষণার যোগ্য। কিন্তু হালে ঘটে যাওয়া কলেজ নির্বাচনে ডুয়ার্সে টিএমসিপি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চেহারা দেখে বিরোধীরা বিরোধিতা ভুলে থম মেরে গিয়েছে। বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা অবশ্য নতুন কিছু নয়। বাম-আমলে এসএফআই সে ব্যাপারে অতিশয় নৈপুণ্য লাভ করেছিল। নতুন হল আসন ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মুষলপর্ব ঘটানো। আশা করা গিয়েছিল যে, বাম-আমলে শিক্ষার প্রতিটি পরমাণুতে আলিমুদ্দিনের উপস্থিত থাকার বিষয়টি দিদির আমলে ইতিহাস হয়ে যাবে। কিন্তু এ বাংলায় 'ইতিহাস' এত তাড়াতাড়ি রচিত হবে না।

ছাত্র সংসদের ফান্ড হাতে রাখার জন্যই নাকি টিএমসিপি-র এই দ্বন্দ্ব। মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই তাঁর বক্তব্যে মনীষীদের নামোল্লেখ করেন। কিন্তু সেসব মনীষীর বিষয়ে ফান্ডকামী ছাত্র নেতারা কতটা অবগত, তা নিয়ে আজকাল খুব সন্দেহ হচ্ছে। দলের উচ্চপর্যায়ের নেতারা যদি এইসব ছাত্রছাত্রীকে ডেকে ছাত্র রাজনীতির গুরুত্ব বিষয়ে এক পাতা লিখতে দেন, তবে কেউই বোধহয় পাশ করবে না। কলেজ হল উচ্চশিক্ষার জায়গা। রাজনীতি সেখানে শিক্ষার অঙ্গ। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব এখান থেকেই আসবে। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ দেখে টেনশন বেড়ে যাচ্ছে সবারই। বিরোধী মতে বিশ্বাসী হলেই ঠেঙিয়ে দেওয়াটা হল এক ধরনের অসভ্যতা। কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতভেদের কারণে পরিবেশকে অস্থির করে তোলাটা বর্বরতা।

কিন্তু কালীঘাট কেন এই দ্বন্দ্ব নিরসনে মাঠে নামল না? বস্তুত, এই নিন্দনীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শাসকদলের বহু শুভানুধ্যায়ী, একনিষ্ঠ সমর্থককে অত্যন্ত আহত করেছে। কলেজ রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের এই নির্লজ্জ প্রয়াসের প্রতি দলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন আতঙ্কিত করেছে বহু কর্মীকে। তাহলে কি দল শেষ পর্যন্ত ক্ষমতালিপ্সুদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে?

ভোটের আগে ভাইয়েরা নিজেদের বুকে ছুরি চালিয়েছে। ভোটের পরেও চলবে। ফান্ড দখলের জন্য সঙ্গীকে রক্তাক্ত করলে ফান্ড হাতে আসার পরেও রক্তপাত অনিবার্য হবে। বাংলার ছাত্র রাজনীতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এর বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগে, যে দিন থেকে পরীক্ষায় পাশ করানোর দাবিতে স্কুলে ঘেরাও এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় চোথা সাপ্লাইয়ের জন্য অভিভাবকদের তৎপরতা শুরু হয়েছিল এই বঙ্গে।

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদনা শ্বেতা সরখেল
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
ইমেল ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়।
মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি
ফোন ০৩৫৬১-২২২১১৭

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

100miles
...Presents
Bhasa Sutra 2017
Kolkata-Dhaka Bicycle Rally
Pedal for Mother Language
to celebrate 21February
অমর একুশে
আমরা বাংলা বলি
আমরা সঙ্গে চলি
বাংলা কখনো হয় না ভাগ
বাংলা ভাষায় আমরা এক...
ভারত - বাংলাদেশ মৈত্রী ভ্রমণ
সহযোগীতায়
মিডিয়া পার্টনার
Experience Bengal
THE SWEETEST PART OF INDIA
Bangladesh Tourism Board
National Tourism Organization
Bangladesh Parjatan Corporation
River & Green Tours
91.9 friends fm
Honey Lemon
Ladies Beauty Salon & Spa
Exclusively for the Ladies, by the Ladies
Mr. Burger
Coffee O' Kobita
ROMANCING CALCUTTA
A JOURNEY THROUGH THE TIME
মানবজমিন
লোক - লোকভাষা - লোকসংস্কৃতি
Roy's
CREATION

খুচরো ডুয়ার্স

কাজিদের শপথ

'মিঞা বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি' বললে আর মানতে রাজি নন ধূপগুড়ির কাজিরা। মানে পুরোহিত, কাজি, যাজকরা। অধিকাংশ গান্ধর্ব বিবাহ এঁদের হাত ধরেই

নিঃশব্দে ঘটে যায়। কিন্ত এবার বয়সের প্রমাণ না দিলে কাজি আর রাজি হবে না। এই সে দিন এক মঞ্চে হাজির হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বাল্যবিবাহ যাতে একেবারেই থেমে যায়, তার জন্য প্রচার চালাবেন। বিজ্ঞজনের মতে, আশু ভ্যালেন্টাইন দিবসের আগে এই সিদ্ধান্ত খুব কাজে দেবে। সংশয়বাদীদের মতে, বার্থ সার্টিফিকেট জাল করা কী এমন ব্যাপার! বিয়ের জন্য লোকে কী না করতে পারে! তা-ই তো!

জ্ঞানের আলো

মহকুমা লাইব্রেরিতে নিখরচায় সদস্যা হতে গিয়ে অভূতপূর্ব আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন জনা পঞ্চাশেক ছাত্রী, এবং, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার, অতিরিক্ত জেলাশাসকও! কথা ছিল 'কন্যাসাথী'র অঙ্গ হিসেবে কন্যাদের দেওয়া হবে গ্রন্থাগারের সদস্যপদ। তা সেই উপলক্ষে লাইব্রেরি আলোয় আলোয় ঝলমল। ঘর মোটেই বড় নয় তো কী হয়েছে! জ্বেলে দেওয়া হয়েছে সোডিয়াম ভেপার। একেবারে চোখের ডগায় বলা চলে। জ্ঞানরূপী ভেপারের আলোয় মুগ্ধ বালিকারা বাড়ি ফিরে দেখল চোখ লাল হয়ে জ্বলছে! না না! জ্ঞানের আলোয় জ্বলছে না! লঙ্কা লাগলে যেমন জ্বলে, তেমনধারা অনেকটা। অতিরিক্ত শাসকের চোখও। পরে জানা গেল যে, চোখের সামনে আলোর বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণেই এই ভোগান্তি। ছোট ঘরে আলো উপচে গিয়ে চোখে ঢুকে গিয়েছে! তা ভাল! ভাগ্যিস বক্তৃতা শোনাবার জন্য মুখের সামনে একটা পিলারাকৃতির সাউন্ড বক্স বসিয়ে দেয়নি! নিন্দুকরা কেন জানি বলছে, লাইব্রেরিতে কন্যেরা যাতে দ্বিতীয়বার না আসে, সে জন্যই এসব অনাসৃষ্টির আয়োজন।

পথের ফাটা সাথি

বীরপাড়াতে 'পথের সাথি' গোত্রের টুরিস্টাবাস চালু করে গম্মেন্ট চেয়েছিল সেখানে রাত কাটিয়ে লোকজন ইতিউতি ঘুরে বেড়াতে পারবে। দিদি এসে উদ্‌বোধনও করে গিয়েছিলেন মাত্র বছর দেড়েক আগে। তারপর থেকে পথের সাথি পথেই দাঁড়িয়ে। কেউ আসছে না তার কাছে। কী করে আসবে? বুক করা যায় না যে! তাই মোটে পনেরো মাস একা একা দাঁড়িয়ে থেকে সে এত্ত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে যে, অঙ্গে ফাটল গজিয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! কী বলিস এসব? মাত্তর পনেরো মাসে ফাটল? তা ভাই, মশলায় সিমেন্ট দিয়েছিল তো? গম্মেন্টের লোকজন বলছে যে, কে ভাড়া দেবে, সেই অতি জটিল, দীর্ঘ আলোচনাযোগ্য বিষয় জরুরি ভিত্তিতে আলোচনা করে মাত্র দেড় বছর সময় নিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অতঃপর উক্ত গোত্রের ভবনগুলি এসজেডিএ দেখভাল করবে। দেখা যাক, এবার রবিবাবু কী করেন!

বাপ রে

পয়লা জানুয়ারি পিকনিক হবে। চমৎকার পরিবেশে মাংস কিনে পিকনিক স্পটের দিকে যাচ্ছিলেন গোপালপুর চা-বাগানের দুই শ্রমিক। এমন সময় আক্রমণ! ছিনতাই হয়ে গেল হাতে ঝোলানো মাংসের প্যাকেট! কবজিতে ক্ষত নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন দু'জন। সাধের পিকনিক লাটে! কিন্ত

অভিযোগ জানাবার উপায় নেই যে! যে ব্যাটা মাংস ছিনতাই করে ভেগেছে, সে এক চিতা বাঘ! ক'দিন ধরেই তল্লাটে চুরি-ছিনতাই করে বেড়াচ্ছিল। শেষে পিকনিকের মাংস ছিনতাই করার পর বন দপ্তর বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে তাকে একখানা ঘুমপাড়ানি গুলি খাইয়ে বাগে এনেছে। এই তো সে দিন ডুয়ার্সের কোথায় জানি বিয়েবাড়ির খাবার ছিনতাই করে পালিয়েছিল হাতিরা। এবার পিকনিকে হানা চিতার!! বাপ রে! ডুয়ার্স বুঝি বুনোরাই নিয়ে নেবে রে!!

হাতি ভাগানিয়া

ডুয়ার্সের হামলাবাজ হাতিদের জন্য কিঞ্চিৎ দুঃসংবাদ। তারা হামলা শুরু করলেই এবার বন বিভাগের হাতি ভাগানো বিশেষজ্ঞদের অকুস্থলে পৌঁছে দেবার জন্য এসে গিয়েছে একজোড়া গাড়ি। সাইরেন লাগানো সে গাড়িতে জোরালো সার্চলাইট, জেনারেটর থাকবে। অত্যধিক বিচ্ছু হাতিদের ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে কাবু করার পর ঠান্ডা জলে স্নান করানোর জন্য থাকবে জলের ট্যাঙ্ক। ধরার পর আচ্ছা করে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার জন্য থাকবে চ্যাপ্টা দড়ি। এক কথায়, হামলাবাজ হাতিদের আরও সতর্ক থাকার মতো পরিস্থিতি! জোড়া হাতি ভাগানিয়া গাড়ির একটা বীরপাড়া গিয়েছে, আরেকটা শুকনায়। পরিস্থিতির মোকাবিলায় হাতিরা জরুরি আলোচনায় বসেছে।

গোড়ায় বালি

ধরুন, দাঁতের গোড়া শক্ত করার জন্য আপনি বৈদিক মতে তৈরি টুথপেস্ট ব্যবহার করে দেখলেন, দাঁত পড়ে গেল! নিশ্চয়ই চটে লাল হয়ে যাবেন। তা, দাঁত না হলেও ফসলের গোড়া শক্ত করার জন্য সার কিনে ছড়িয়েছিলেন রায়গঞ্জের বেশ কিছু চাষিভাই। ফল পেয়েছেন উলটো! গোড়ায় ভেবেছিলেন, ভুতুড়ে ঘটনা। পরে টের পেলেন, সার ভেবে যেটা দিয়েছেন, সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখতেই চমক! কোথায় ফসফেট সার! এ যে চাচা স্রেফ হলদে রং করা বালি গো! মানে, বালুকা! গন্ধের জন্য এট্টুখানি রাসায়নিক মিশিয়ে দেওয়া। এর পর আরও খোঁজ নিতে আরও চমক! সাররূপী বালুকার কারখানা যে গাঁয়ের মধ্যেই। এক হতচ্ছাড়া বাড়ির পিছনে কারখানা বানিয়ে দেদার বানাচ্ছে বালুকাসার! অতঃপর জোর তল্লাশি করে জানা যাচ্ছে

আরও চমকদার সন্দেশ! নকল সার নাকি রমরমিয়ে বিক্রি হয় মার্কেটে! কী সব্বনাশ!!

আহা গুরুং

কালিম্পং জেলা হয়ে যাচ্ছে। সে নিয়ে জোর মচ্ছবের কথাও শোনা যাচ্ছে। পাহাড়ের মানুষ বেশ উত্তেজিত তা নিয়ে। কিন্তু গুরুংবাবুর মুখটি কেমন ভার ভার। গজমম-র নারীবাহিনী ছেড়ে সে দিনই গুচ্ছ গুচ্ছ সদস্যা হাসিমুখ করে দিদির খাতায় নাম লিখিয়ে ভারী নেচে বেড়াচ্ছে চারদিকে। 'গোর্খাল্যান্ড' নিয়ে হুংকারযুক্ত আন্দোলনের কথা বললেও পাবলিক ফিরে তাকাচ্ছে না। ওদিকে দেখো! হরকাবাবুর মুখে হাসি আঁটছে না! দিদির বাহাদুর ভাইয়ের মতো মহাফুর্তি নিয়ে ঘাসফুলে জল দিচ্ছেন। এর পর কি গুরুংবাবুর রাতে শান্তিতে ঘুম আসে গো? হতচ্ছাড়া হরকা! খামকা বলে দিলে যে আলাদা রাজ্যের আর দরকার হচ্ছে না? এইবার দেখিস! গোর্খাল্যান্ড আদায় করার জন্য কী করি! একটু ভাবতে দে কেবল!

ফেস বকুনি

বউ জানত যে বর কিষানগঞ্জের বান্ধবীর সঙ্গে খুব ফেসবুক করে! তা ফেসবুক বলেই বউ চুপচাপ ছিল। কিন্তু সে মেয়ে যে বরের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়িতে চলে আসবে, তা কে জানত? তাই যে দিন দেখল বরের টানে মেয়ে এসেছে বাড়ির চৌকাঠে, অমনি ফর্মে ফিরলেন বউ। বান্ধবীর ফেস-এ চমৎকার স্বাগত চপেটাঘাত করলেন প্রথমে। তারপর যাকে বলে রীতিমতো ধোলাই প্রদান! বেচারা বান্ধবী তিন লাফে কিষানগঞ্জ ফিরতে পারলে বাঁচে। বর যতই বলে, আরে! এ আমার স্রেফ বান্ধবী, বউ ততই ঘুসোয়! বলে, ফেসবুক থেকে মুখ দেখাতে বাড়ির দরজায় কেন বাপু? বান্ধবী তো ফেসবুকে প্রোফাইল পিকচার দেখাও। রিয়্যালে দেখাচ্ছ কোন আক্কেলে? তা, পরে নাকি পুলিশ এসে সামলেছে! যাক! উত্তর দিনাজপুরের কাণ্ড। চাকুলিয়ায়।

শিশুর জুয়া

শিশুবাড়িতে জুয়াড়িদের দাপটই আলাদা। তারা পুলিশকে ফোন করে বলে, স্যার! আমাকে জুয়ার বোর্ড লাগাতে দিচ্ছে না। তাদের নামে বাস স্টপের নামকরণ হয়। প্রতিবাদ করলে এলাকাছাড়া করে দেয় পরদিনই। কেউ কেউ থানায় এজাহার লেখাতে নাকি গিয়েছিলেন সাহস করে। পুলিশ পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিয়েছে। অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেল, সেখানকার হাটে জুয়া কারবারিদের মৌরসিপাট্টা। সে গম্মেন্টের আমলেও চলত, এ গম্মেন্টের আমলেও চলছে। এমন সব বাঘা বাঘা লোক জড়িত যে, অভিযোগ পেলে পুলিশ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবশ্যি, গম্মেন্টের দলের লোকেরা বলছে, হাটে জুয়া খেলা হলেও আমরা চালাইনেকো। কী কাণ্ড ভাবুন দিকি কাকা! নিজে চালাস না, ভাল কথা! তা বলে অন্যেরা চালালে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি? তোরা না শাসক? নিজেরাই খেলছিস না তো?

পুলিশের দু'আঙুল

বীরপাড়ায় এ কী গোলমেলে ঘটনা! কলেজ নির্বাচনে নিয়মমতো শাসকদল জিতে গিয়েছে। হইহই করে মিছিল চলছে পথ বেয়ে। পড়ুয়ারা দু'আঙুল তুলে 'ভি' চিহ্ন দেখিয়ে জয় পালন করতে করতে চলছে। ছবিও উঠছে টপাটপ। নিমেষে চলে যাচ্ছে সোশাল মিডিয়ায়। দুমদাম লাইক! হেনকালে এক ছবি দেখে পাবলিক থ! আরে এ কী! ছাত্রছাত্রীদের পিছেন আঙুল তুলে 'ভি' দেখাতে দেখাতে ওটা কে হাঁটছে? এ তো পুলিশ! সঙ্গে সঙ্গে প্রবল চেঁচামেচি! পুলিশ কেন 'ভি' দেখায় হে? সে বুঝি নির্বাচনে হেল্প করেছে? নাকি পুলিশ সেজে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছিল কলেজে? অভিযুক্তরা নাকি জবাবে বলেছে, আহা! দেখিয়েছে তো কী হয়েছে? পুলিশ বলে কি মানুষ নয়?

বেরসিক বিল

কোচবিহার জেলার রসিক বিল খাতায়-কলমে পর্যটনকেন্দ্র। সেখানে ঢুকতে টিকিট লাগে, আবার বিনা টিকিটেও ঢোকা যায়। মানে, বিলের চারধারে খাড়া হওয়া বেড়া মাঝে মাঝে ভ্যানিশ থাকার কারণে টিকিট না কাটলেও চলে। বিলের জলে থাকার কথা টলটলে স্বচ্ছতা, বদলে রাশি রাশি কচুরিপানা। অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে, দুর্দান্ত একটা প্রজাপতি উদ্যান বানানো হবে। কিন্তু সেটার দেখা নেই। তবে আশার কথা এই যে, সার্ভে নাকি শেষ। এবার গাছ লাগানো হবে। গাছ হলে প্রজাপতি আসবে। প্রজাপতি এলে উদ্যান হবে। উদ্যান হলে... থাক বাবা! আগে গাছ তো পুঁতুক।

সত্যি

হ্যাঁ মশাই! শুনছি মালবাজার থেকে শ্মশান যাওয়ার রাস্তাটা নাকি এমন বিগড়েছে যে, মাঝে মাঝে ডেডবডি পর্যন্ত মাচা থেকে ঘাড় তুলে দেখে নেয় চুল্লি আর কত দূরে? শুনছি নাকি সে রাস্তা খোদ পুরপতি স্বপনবাবুর তালুকে? শোনা যাচ্ছে, এলাকার পাবলিক দুঃখ করে বলছে, 'স্বপনবাবু! শ্মশানগামী পথে তো জ্যান্ত লোকরাও হাঁটাচলা করে! ভূতপ্রেতরা না-হয় উড়ে যাওয়ার সুবিধে পায়, কিন্তু আমরা কী করি কন দেখি?' শুনছি, এই শুনে স্বপনবাবু অভয়বাক্য উচ্চারণ করে বলেছেন, হচ্ছে হচ্ছে। সব সত্যি? তাহলে ঠিক আছে।

টুকরাণু

জোর 'পিঠে বানাও' কম্পিটিশন রায়গঞ্জে। ডুয়ার্সে শাসকদলের ঠেঙানি খাওয়ার আশঙ্কায় বিজেপি কর্মীরা। রাজবংশী ভাষা দিবসেও শাসকদলের সেমসাইড গোলমাল অব্যাহত জলপাইগুড়িতে। ফুলবাড়ি ব্যারেজ থেকে ভবিষ্যতে চিরকালীন চম্পট দিতে পারে পরিযায়ী পাখিরা। জোড়া বাইসনের জোর হামলায় অস্থির নাগরাকাটা। গোরুমারা লাগোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে সরস্বতী পুজো বানচাল করে দিল এক দলছুট হাতি। দেওয়ানগঞ্জের বাচ্চাদের পার্কে জমজমাট দারুপানের নিয়মিত আসর ধেড়েদের। লেহেঙ্গা না শাড়ি— এই নিয়ে শিলিগুড়িতে বউ-শাশুড়ির তীব্র ঝগড়া গেল থানা পর্যন্ত। হ্যান্ডবিলে নাম না থাকায় অভিমানে কৃষিমেলা উদ্‌বোধন করতে গেলেন না শীতলকুচির বিধায়ক। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জুজুতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী আরাধনা বাতিল। সারমেয়দের স্বর্গবিশেষ বালুরঘাট হাসপাতাল। দামের অভাবে আলু চাষিদের হৃৎকম্প ডুয়ার্সে।

বন্ধ ও ধুঁকতে থাকা চা-বাগানের শ্রমিকের দুরবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকারকে কতটা দায়ী করা যায়?

ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলোতে করুণ চিত্রের ছবি সরেজমিনে দেখে কাঠগড়ায় রাজ্য সরকারকে তুলেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। অথচ রাজ্য সরকারের ঘোষিত বিশেষ প্রকল্প অনুযায়ী সে চিত্রের সামান্য হলেও পরিবর্তন আশা করেছিল সবাই। প্রশ্ন জাগে, তবে ফাঁকটা কোথায় থেকে যাচ্ছে? একদিকে অপুষ্টি নিয়ে দরিদ্র শ্রমিকদের সচেতন করার কর্মসূচি চলছে, অন্য দিকে অনাহারে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকা শ্রমিকদের ভিন রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ধান্দায় ব্যস্ত আড়কাঠিরা। বন্ধ বাগানের হাহাকার পরিস্থিতির ফায়দা তুলছে দালালচক্র। পরিকাঠামোর অভাব স্বীকার করে নিচ্ছেন শ্রম মন্ত্রীও। তবে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসা যে একা রাজ্য সরকারের সাধ্য নয়, সেটাও সত্য। নোট বদলের গেরোয় বাগানের পরিচর্যা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃতি এ সময় অনুকূলেই, ফলে চায়ের উৎপাদন বেড়েছে। পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজও অনেকটাই সুরাহা আনতে পারে বেরোজগার চা শ্রমিকের জীবনে। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর পক্ষ থেকে চায়ের ডুয়ার্সের কোণে কোণে ঘুরে তুলে আনা জ্বলজ্যান্ত ছবি পেশ করছেন **ভীষ্মলোচন শর্মা** তাঁর ধারাবাহিক প্রতিবেদনের **দশম পর্বে**।

জাতীয় মহিলা কমিশনের সাম্প্রতিক সফর

বন্ধ এবং ধুঁকতে থাকা চা-বাগিচার দুরবস্থার যাবতীয় দায় রাজ্য সরকারের কাঁধে চাপিয়ে দিল জাতীয় মহিলা কমিশন। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে তরাই এবং ডুয়ার্সের বন্ধ এবং ধুঁকতে থাকা আটটি চা-বাগান পরিদর্শন করে সোজাসাপটা ভাষাতে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে চার দিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষ করে দিল্লি ফিরে যাবার আগে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়ে জাতীয় মহিলা কমিশনের অন্যতম সদস্যা রেখা শর্মা বলেন, বাগানগুলিতে পানীয় জলের তীব্র সংকট, বিদ্যুৎসহ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার অভাব, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ওষুধের অপ্রতুলতা নিয়ে ভয়াবহ দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছে বন্ধ এবং ধুঁকতে থাকা চা-বাগিচা শ্রমিকরা। ডুয়ার্সে একাধিক বাগান নিজেদের হেপাজতে নিলেও সেখানে সমবায়ের নামে বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে বাগান তুলে দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজে ছাত্রা রায়পুর চা-বাগিচার ৩০০ পরিবারের উপর সার্বিক সমীক্ষা এবং মেডিক্যাল ক্যাম্প আয়োজন করে দেখে যে, অতিরিক্ত পরিমাণ মদ্যপানে লিভারের বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে রায়পুর চা-বাগিচার কুলি লাইনে। উচ্চরক্তচাপ, টিবি, কাশি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে পেটের রোগ ধরা পড়ছে। কথা বলছিলাম বাগানের গুদাম লাইনের শ্রমিক কমলা ওঁরাওয়ের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে কমলা বহিন জানালেন, বাগানের নিজস্ব চিকিৎসক নেই। চিকিৎসার জন্য সপ্তাহে দু'দিন মেডিক্যাল ক্যাম্পই তাদের ভরসা। না হলে ১০ কিলোমিটার দূরে জেলা হাসপাতালে যেতে হয়।

এখন ডুয়ার্সের চোখে

রায়পুর চা-বাগানে গুদাম লাইনের সুমন মুন্ডা, শিবু সাওয়াসিরা জানালেন, বাগান খোলা থাকলেও বাড়তি রোজগারের জন্য বাইরে মজুরের কাজ করতে যেতে হয়। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও ঠিকমতো হচ্ছে না। নোটের সমস্যার জন্য মজুরি পেতে দেরি হচ্ছে। বার্ধক্য, অবহেলিত শরীর, অতিরিক্ত মদ্যপান, অপুষ্টিজনিত সমস্যার কারণে বিভিন্ন রোগে ভুগছে শ্রমিকরা। রায়পুর চা-বাগিচার শ্রমিকসংখ্যা ৫০২। জনসংখ্যা ২,৫০০ জন গড়ে। গত কয়েক বছর ধরে চা-বাগিচাটি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি অর্জন করেছে। কিন্তু মাংরি ওঁরাও কী করবে? বিরল রোগে আক্রান্ত গাঠিয়া চা-বাগানের আপার ডিভিশনের শ্রমিক কন্যা মাংরি ওঁরাও। গাঠিয়া চা-বাগানের ফ্যাক্টরি থেকে পাথর ও খানাখন্দে ভরা ৪ কিলোমিটার সোজা যে পথ চলে গিয়েছে ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত, তার কিছুটা আগে ডান দিকে বাঁক নিলেই মাংরিদের শ্রমিক আবাস। মহল্লাটি চামু লাইন নামে বাগানে পরিচিত। বয়স যত বাড়ছে, মাংরির দু'টি চোখই ততই কোটর থেকে যেন ছিটকে বাইরে বার হয়ে আসতে চাইছে। অন্ধত্বও নেমে এসেছে মাতৃহীন একরত্তি জীবনে। পরিবারে অসহায়তাই এখন নিত্যসঙ্গী। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, 'রেটিনো ব্লাস্টামো' নামে এই দুরারোগ্য এবং বিরল রোগে দু'টি চোখই কোটর থেকে বার করে ফেলা ছাড়া বর্তমানে আর কোনও বিকল্প নেই। এর জন্য অস্ত্রোপচার করাতে হবে। গাঠিয়া বাগানের দুর্গা ওঁরাও, পিরুয়া ওঁরাওরা ক্ষেত্রসমীক্ষা চলাকালীন সময়ে জানিয়েছিলেন, প্রথম দর্শনে ওর চোখ দু'টি দেখলে ভয়ই লাগে। মাংরির বাবা বিজলার দু'মুঠো ভাত জোগাড় করতেই কালঘাম ছুটে যায়। বাগানের অস্থায়ী শ্রমিক বিজলার কাজ জুটলে মজুরি মেলে। মেয়ে, মা, ভাইকে নিয়ে পরিবারের চারজন সদস্যের ভরণপোষণ চালাতেই নাকাল দশা গৃহকর্তা বিজলার। তাই হতাশাই নিত্যসঙ্গী বিজলা এবং মাংরি ওঁরাওয়ের।

রাজ্য সরকারের বিশেষ প্রকল্প তবু হাল বদলায় না কেন?

অথচ একটা কথা ভাবলে বিস্ময় সৃষ্টি হয় যে, চা-বাগানগুলির কর্মহীন, অবসরপ্রাপ্ত, অসুস্থ এবং বিধবা শ্রমিকদের সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার বিশেষ প্রকল্প তৈরি করেছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই বিশেষ প্রকল্পগুলির সুযোগ শ্রমিক পরিবারগুলি পাচ্ছে না কেন? প্রতি মাসে শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সাহায্য আসছে। কথা হচ্ছিল আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক অফিসের জনৈক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চা-বাগানগুলির ফাউলাই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এই আধিকারিকের কাছ থেকে জানা গেল, জেলার প্রায় তিন হাজার শ্রমিকের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রতি মাসে ৩১ লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর করেছে। অবসর নেওয়ার পরেও যাদের সংসার চালাতে হচ্ছে, তারা ছাড়াও কর্মহীন শ্রমিকদের মধ্যে যাদের সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে, তাদেরকেও আর্থিক সাহায্য করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসুস্থদের মধ্যেও অনেককে রোজগারের জন্য ছুটে বেড়াতে হচ্ছে, বিধবা ও বার্ধক্যদের মধ্য থেকে সহায়তাপ্রাপকদের নাম বাছাই করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী দূরভাষে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে জানান যে, আগে শুধুমাত্র বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা ফাওলাইয়ের টাকা পেত, কিন্তু রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে এই নিয়মে বন্ধ ও চালু বাগানের দুঃস্থ শ্রমিকরা এক হাজার টাকা করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পাবেন। এখন প্রশ্ন জাগে, সরকার তো বহুবিধ প্রকল্প গ্রহণ করছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র খাতা-কলমেই নয় তো? তাহলে অপুষ্টি, দারিদ্র, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত চা শ্রমিক পরিবারগুলির দারিদ্রমোচন হবে কী করে?

পুষ্টি দিবসে চা-বলয়ের মানুষকে পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়ে ব্লক প্রশাসন একটি বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল মেটেলি ব্লক শিশু বিকাশ সুসংহত দপ্তর। বড়দিঘি চা-বাগানে। গর্ভবতী অবস্থায় মায়েদের কোন কোন খাবার প্রয়োজন, বাড়ির পাশে ও বাড়িতে কী কী খাবার পুষ্টিদায়ক, কম খরচে কী কী খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে অধিক পুষ্টি পাওয়া যায় তা উদাহরণ সহকারে এবং হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। চা-বলয়ের সাধারণ গরিব মানুষরা যাতে তাদের সাধ্যের মধ্যে থেকেই যাবতীয় পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে, তার পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য কী কী তাদের খাওয়ানো প্রয়োজন এবং কী করে খাবার রান্না করে খেতে হয়, সেই সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় ওই অনুষ্ঠানে। বড়দিঘি চা-বাগানের ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার চঞ্চল মিত্র বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠানের ফলে চা-বলয়ের মানুষ পুষ্টি সম্পর্কে আরও

> আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী দূরভাষে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে জানান যে, আগে শুধুমাত্র বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা ফাওলাইয়ের টাকা পেত, কিন্তু রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তে এই নিয়মে বন্ধ ও চালু বাগানের দুঃস্থ শ্রমিকরা এক হাজার টাকা করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সহায়তা পাবেন। এখন প্রশ্ন জাগে, সরকার তো বহুবিধ প্রকল্প গ্রহণ করছে, কিন্তু তা শুধুমাত্র খাতা-কলমেই নয় তো? তাহলে অপুষ্টি, দারিদ্র, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত চা শ্রমিক পরিবারগুলির দারিদ্রমোচন হবে কী করে?

সচেতন হয়ে উঠবে। পুষ্টি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আইসিডিএস থেকে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, সে সম্পর্কেও জানানো হয় চা শ্রমিকদের।

পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা শোনা গেল শ্রম মন্ত্রীর বক্তব্যে। 'বন্ধ চা-বাগানগুলিতে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকরা আধপেটা খেয়ে আছেন। অনাহারে যাতে কেউ মারা না যান তা দেখতে হবে। বন্ধ বাগানের শ্রমিকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কমে গিয়েছে, তাঁরা অপুষ্টির শিকার হচ্ছেন।

বেশির ভাগ বাগানেই প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু পর্যন্ত হয় না। হাতুড়ে চিকিৎসক দিয়ে অনেক জায়গায় চিকিৎসা চলছে। তাঁরা যে মজুরি পান, তাতে কিছুই হয় না।'

বাগানগুলিতে বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়তে কেন্দ্রীয় সরকার, ইউনেস্কো, আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের কাছেও দরবার করা হবে বলে মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু জানান। প্রশ্ন উঠছে এখানেই। শ্রম মন্ত্রী পরোক্ষেই স্বীকার করে নিচ্ছেন চা-বাগিচাগুলিতে পরিকাঠামো বেহাল। সেই কারণেই জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা তরাই ও ডুয়ার্সের বন্ধ এবং ধুঁকতে থাকা চা-বাগিচা শ্রমিকদের পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর করতে এলে আগে থেকে খবর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা উপযুক্ত সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। চার দিনে মোট ন'টি চা-বাগান পরিদর্শন করেন রেখা শর্মা। শুরু থেকেই জাতীয় মহিলা কমিশনের এই দলটির সঙ্গে ছিলেন চা-পর্ষদের কর্তারা। তরাইয়ের পানিঘাটা, ত্রিহানা, ডুয়ার্সের সুরেন্দ্রনগর, রেড ব্যাঙ্ক, ধরণিপুর, বান্দাপানি, ঢেকলাপাড়া, জয়বীরপাড়া, সই মকাইবাড়ি চা-বাগান পরিদর্শন করেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের দেওয়া নোটশিটে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে রাজ্য সরকারকেই। চা-পর্ষদের ওভারসাইট কমিটির সদস্য সঞ্জীব বিশ্বাস প্রতিবেদককে জানান, ডুয়ার্সের পাঁচটি রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত বাগানের জমি লিজ দিয়েছে রাজ্য সরকারই। তাই বন্ধ এবং ধুঁকতে থাকা বাগানের দুরবস্থার জন্য রাজ্য সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার অভিযোগ, রেশনে অত্যন্ত নিম্নমানের চাল বণ্টন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র দু'বেলা খাবারের জন্য বাগানগুলি থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে মহিলা ও শিশুরা। রেখা শর্মার অভিযোগ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি রাজ্য সরকারের কোনও উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

এখন ডুয়ার্সের চোখে

সিটি অটোর ভিতর ঠাসাঠাসি ভিড়। মাথায় ব্যাগের স্তূপের উপরে অনেকে। দরজা-জানলা এমনকি পিছনেও ঝুলছে অনেকে। বাগানের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে অটো চলে যেতেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাদের কেউ বা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন, আবার কেউ বা অটোর দিকে চেয়ে হাত নেড়েই চললেন। ভিন রাজ্যে কাজ খুঁজতে যাওয়া স্বামী-ছেলেদের বিদায় দেবার এই দৃশ্য জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া রায়পুরে। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর রায়পুর চা-বাগান ফের খুলে যায়। কিন্তু

কাজের খোঁজে দিল্লি গিয়েছিল চা-বাগিচার বাপ-মরা ষোলো বছরের মেয়েটা। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ফিরল টানা তিন বছর পর। বাক্‌শক্তি হারানো উন্মাদ মেয়েকে আগলে রয়েছেন অচল চা-বাগানের কর্মহারা শ্রমিক মা। সান্ত্বনা একটাই যে, মেয়েটাকে জীবন্ত পাওয়া গিয়েছে। ২০১৪ সালে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে গিয়ে ফেরেনি ডিমডিমা চা-বাগানের সাবিনা।

পরবর্তীকালে প্রায় দেড় মাসের মজুরি, বেতন এবং পুজোর বোনাস বকেয়া রেখে বাগান ছেড়ে মালিকপক্ষ চলে যায়। অন্য দিকে, মালিকপক্ষের অভিযোগ, শ্রমিকদের একাংশের নিজেদের মধ্যে বিরোধের কারণে পরিচালনার কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয়। একাংশ শ্রমিক পুরো দিনের কাজ করে না। অন্য দিকে, চা শ্রমিকদের বক্তব্য, শীতের সুখা মরশুমে চা-পাতা ওঠা বন্ধ হয়ে যায়। শীতকালে পাতা তোলা বন্ধ হয়ে গেলে মালিকের অনুপস্থিতিতে চলবে কেমন করে, সেটা ভেবেই রায়পুরের শতাধিক বাসিন্দা ভিন রাজ্যে যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে। শ্রমিকদের কেউ বা গিয়েছে দিল্লি, কেউ বা কেরল।

কে না এসেছে তরাই এবং ডুয়ার্সের চা-বাগিচাক্ষেত্রে? ২০১৬-র অক্টোবর মাসে এসেছিলেন ন্যাশনাল কমিটি অব এসটি-র চেয়ারম্যান রামেশ্বর ওঁরাও। বন্ধ চা-বাগিচাগুলির সমস্যা এবং চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা প্রদানসহ আরও নানা প্রকার বিষয় নিয়ে তিনি পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করলেন। এর আগে ২০০৯ সালে কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ঊর্মিলা সিং ডুয়ার্স-তরাই সফরে এসেছিলেন। সেটাই গত আট বছরের মধ্যে উপজাতি বিষয়ক জাতীয় কমিশনের সর্বোচ্চ কোনও কর্তার সর্বশেষ চা-বাগান পরিদর্শন। ডুয়ার্স-তরাইব্যাপী আদিবাসীদের জমি বেআইনিভাবে হস্তান্তর, গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের পঞ্চায়েতকেন্দ্রিক পরিষেবাসমূহ ঠিকমতো না-মেলা, চা-বাগান থেকে নারী ও শিশু পাচারের মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলি রামেশ্বর ওঁরাওয়ের দৃষ্টিগোচর করা হয়। বিকাশ পরিষদের অভিযোগ, এই ধরনের কমিশন আসে, পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ হয়, আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিকল্পে কর্মসূচি গৃহীত এবং পালিত হয়। অথচ আদিবাসীদের কোনও প্রকৃত উন্নতি হয় না।

কাজের খোঁজে দিল্লি গিয়েছিল চা-বাগিচার বাপ-মরা ষোলো বছরের মেয়েটা। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় ফিরল টানা তিন বছর পর। বাক্‌শক্তি হারানো উন্মাদ মেয়েকে আগলে রয়েছেন অচল চা-বাগানের কর্মহারা শ্রমিক মা। সান্ত্বনা একটাই যে, মেয়েটাকে জীবন্ত পাওয়া গিয়েছে। ২০১৪ সালে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে গিয়ে ফেরেনি ডিমডিমা চা-বাগানের সাবিনা। নবম শ্রেণির ছাত্রী সাবিনা পরিচিত একজনের হাত ধরে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিল। পিতৃ-মাতৃহারা সাবিনার দুই বোন আজও জানে না, দিল্লিতে কী কাজ করত সাবিনা বা কীভাবেই মারা গিয়েছিল সে। ডানকানস-এর ডিমডিমা চা-বাগানের উঠতি বয়সের কিশোরী-তরুণীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এই করুণ চালচিত্র শুধু বাগান বন্ধ বা অচল থাকলেই চোখে পড়ে তা নয়। অনেক কিশোরী বা তরুণী যখন চা-বাগান ছেড়ে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে দূর অজানার উদ্দেশ্যে, তখন কিন্তু চা-বাগান অচল ছিল না। তবে বাগান অচল হওয়ার পর আড়কাঠিদের টোপ ফেলতে বেশি সুবিধা হয়। হাতে স্মার্টফোন, পরনে চাপা লেগিংস বা জিন্‌স, ঠোঁটে লিপস্টিক, গায়ে ভুরভুর করছে পাউডারের উগ্র সুবাস। অচল চা-বাগান ডিমডিমার শ্রমিকমহল্লায় মাঝে মাঝে এমন পোশাকে দেখা যায় কিছু উঠতি বয়সের কিশোরীকে। চা-বাগান যেখানে অচল, শ্রমিকমহল্লার ঘরে ঘরে চাল যেখানে বাড়ন্ত, সেখানে এমন চোখ ধাঁধানো জীবনযাত্রার উৎস কী? উত্তর খুঁজছিলাম বাগিচাগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে করতে।

ক্যারন বাগানের বড়বাবুই উত্তরটা দিলেন, 'বুঝতে পারছেন দাদা, হাতে ওদের কাঁচা পয়সা আসছে। কীভাবে এত তাড়াতাড়ি পালটে যায় জীবন, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। এমন মেয়েদের এখন টোপ হিসেবে ব্যবহার করে মেয়ে ধরার আড়কাঠিরা। বাগানের ঘরে ঘরে দারিদ্র। একটু ভাল খাওয়া-পরা তো বটেই, ওদের দেখে আজ রঙিন স্বপ্ন দেখে চা-বাগানের হা-অন্ন ঘরের উঠতি বয়সি ছেলেমেয়েরা। ফলে রঙিন জগতের হাতছানিতে এক-এক করে স্কুল ছেড়ে ওরা দাঁড়াচ্ছে রাস্তায়। অন্ধকার জগতে এক-এক করে তলিয়ে

যাচ্ছে চা-বাগানের উঠতি প্রজন্ম।' বাগান বন্ধ থাকুক বা চালু, চা-বাগিচায় সক্রিয় মেয়ে পাচারের আড়কাঠিরা। তাদের হাত ধরে দুটো ভাল খেতে-পরতে পাওয়ার আশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে কখনও চিরতরে নিখোঁজ হয় চা-বাগান মহল্লার মেয়েরা, কখনও ফেরে স্রেফ লাশ হয়ে, কখনও বা ফেরে অন্তঃসত্ত্বা কিংবা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে। কী-ই বা করা যাবে, খেতে-পরতে হবে তো, তাই মেয়েকে ভিন রাজ্যে পাঠাতে দু'বার ভাবছেন না চা-মহল্লার কর্মহারা অনেক শ্রমিক। আসলে কে বা কারা পাচারে যুক্ত রয়েছে, অনেক সময়ে টের পাওয়া গেলেও সকলে নিরুপায়। চা-বাগানের কিছু দাপুটে 'দাদা' মদত দেয় মেয়ে ধরার আড়কাঠিদের। এমনই ছবি বন্ধ, অচল বাগানের ঘরে ঘরে। বাগানের ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা জানে, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা জানে, জানে প্রশাসন, পুলিশের কর্তারাও। তবু কীসের জোরে সকলকে চুপ করিয়ে আড়কাঠিরা বাগান থেকে মেয়েদের এভাবে তুলে নিয়ে যায়? বাগানেরই এক মাসির হাত ধরে কাজের খোঁজে গিয়েছিল ১৫-১৬ বছরের দুই কিশোরী। একজন পালিয়ে এসেছে। অপরজন এখনও নিখোঁজ। জানা গিয়েছে, বিহারের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অনুষ্ঠানে ওদেরকে দিয়ে অশ্লীল নাচ প্রদর্শন করানো হত।

প্রকৃতির বরদান আজও বহাল

তবে সবকিছু নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই হয় না। সমস্যা যেমন আছে, সমস্যার সমাধানও তেমন আছে। প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক-সরকারপক্ষের মেলবন্ধন। চা-মহল সূত্রেই জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট— এই নয় মাসে শিলিগুড়ির নিলামকেন্দ্রে বিক্রি হওয়া তৈরি চায়ের গড় দাম ছিল ১৫৭ টাকা। বড় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চা-বাগান ধরে ওই গড় দাম ২০১৫ সালে ছিল ১৫৬ টাকা। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি এই সময়কালের মধ্যে দাম পেয়েছে ১১২ টাকার কিছু বেশি, যা আগের বছরের তুলনায় ১৩ টাকার কিছু বেশি। অক্টোবরের অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি এবং তারপরই মেঘ কেটে গিয়ে শরৎসুলভ রোদ অটাম ফ্ল্যাশ বা হেমন্তকালীন উৎপাদনের পথ প্রশস্ত করেছিল। এমন পরিস্থিতি প্রায় এক যুগ পরে ফের তৈরি হয়েছে বলে চা-বাগিচাগুলি জানিয়েছিল। তাহলে শীতকালে কাটিং-এর সময়ে উৎপাদন হয় না বলে মালিকপক্ষ বন্ধ রাখবে কেন বাগানগুলি? হৈমন্তিক চায়ের বিশেষত্বই হল অন্য মরশুমের থেকে গুণগতভাবে তা অনেকটাই আলাদা। ফলে প্রাকৃতিক কারণে যে নতুন কুঁড়ি বন্ধ্যা মরশুমেও চা-গাছগুলিতে এসেছে তা সে মোট উৎপাদনকে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দেবে শুধু তা-ই নয়, দামও মিলবে চড়া হারে। গড়ে ১৫ শতাংশ দাম বৃদ্ধি যে নিশ্চিত, সেটা চা শিল্পমহল থেকেই জানা গিয়েছে। উৎপাদনও বাড়বে ১০-১৫ শতাংশ হারে। ডুয়ার্সের একটি প্রতিষ্ঠিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চা-বাগানের ম্যানেজার জানালেন, জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত তাঁরা নিলামে তৈরি চায়ের গড় দাম পেয়েছেন ১৭৫ টাকা। অটাম ফ্ল্যাশ-এর কারণে নতুন কাঁচা পাতা যে নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে তাই নভেম্বর এবং ডিসেম্বর— এই দুই মাসে উৎপাদন বাড়বে ১৫ শতাংশ হারে। ২০১৫-র নভেম্বরে যেখানে মোট উৎপাদন ছিল ৭০,০০০ কিলোগ্রাম, তা বেড়ে এবার হয়েছে ৮০,০০০ কিলোগ্রাম। বাড়তি ১০,০০০ কিলোগ্রাম উৎপাদনপ্রাপ্তির জন্য বর্ধিত দামের হিসেবে অতিরিক্ত আয়ের একটা অংশ তাহলে বাগানগুলির পরিচর্যা, শ্রমিকদের আবাস, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শ্রমিক পরিবারগুলির সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে না কেন? অথচ লক্ষ করে দেখা যাচ্ছে, নানান ছুতোনাতায় বাগানগুলি শীতের মরশুমে বন্ধ করে দিতে প্রয়াসী হচ্ছেন মালিকপক্ষ। সরকারও উদাসীন। তাই জাতীয় মহিলা কমিশনের রাজ্য সরকারকে সমালোচনার দায়ভার যে রাজ্য সরকারেরই, সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নেই।

ডুয়ার্সে প্রায় ২০টির মতো বাগান আছে, যাদের তৈরি চা নিলামে ২০০ টাকা কিলোগ্রাম দরে বিক্রি হয় কেবলমাত্র গুণগত উৎকর্ষর জন্য। অক্টোবর মাসে গড়ে ৬-৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত বাগিচাগুলির কৃত্রিম জলসেচ বাবদ খরচকেও অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। যেহেতু বৃষ্টি হলে মাটি আর্দ্র থাকে তাই নভেম্বর মাসে কৃত্রিম জলসেচের খরচ বাবদ যে সাশ্রয় হয়েছে, সেটাও স্বস্তিদায়ক। ডিসেম্বর মাস থেকে কৃত্রিম জলসেচ প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় খরচাও

তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম হবে। চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন ডিবিআইটিএ সূত্রে জানা গিয়েছে, চির-আকাঙ্ক্ষিত অক্টোবর মাসের বৃষ্টির পাশাপাশি রাতের তাপমাত্রায় স্থিতাবস্থা না থাকলে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার পাশাপাশি হৈমন্তী চায়ের ক্ষেত্রে রাতের তাপমাত্রায় স্থিতাবস্থা থাকলে উৎপাদন এবং দামে গুণগত পরিবর্তন আসে। টি অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (টাই)-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক তথা

নোট বদলের পর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সপ্তাহে ৫০,০০০ টাকার বেশি তোলা যাবে না এমন নিয়মের গেরোয় পড়ে শীতকালীন পরিচর্যার কাজ কার্যত মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করেছিল উত্তরের বাগিচাক্ষেত্রগুলিতে। ফলে ভরা মরশুমে চায়ের উৎপাদন এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলে। কারণ চা-বাগিচায় শীতকালীন পরিচর্যার কাজ শুরু হয় নভেম্বরের শেষ থেকে। চলে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

বিশিষ্ট চা-বাগান বিশেষজ্ঞ রাম অবতার শর্মা একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, অক্টোবরে বৃষ্টির সুফল নভেম্বরে পাওয়া যাবে। হেমন্তকালীন উৎকৃষ্ট চায়ের দাম যে বাড়বে, সে ব্যাপারেও তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। ডিবিআইটিএ-র সম্পাদক সুমন্ত গুহঠাকুরতাও একই রকম আশাবাদী ছিলেন।

নোট বদলের গেরোয় ক্ষতিগ্রস্ত বাগানের পরিচর্যা

নোট বদলের পর ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে সপ্তাহে ৫০,০০০ টাকার বেশি তোলা যাবে না এমন নিয়মের গেরোয় পড়ে শীতকালীন পরিচর্যার কাজ কার্যত মুখ থুবড়ে পড়তে শুরু করেছিল উত্তরের বাগিচাক্ষেত্রগুলিতে। ফলে ভরা মরশুমে চায়ের উৎপাদন এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলে। কারণ চা-বাগিচায় শীতকালীন পরিচর্যার কাজ শুরু হয় নভেম্বরের শেষ থেকে। চলে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। এ সময়ে নতুন কুঁড়ি পাওয়ার জন্য চা গাছগুলিকে ছেঁটে ফেলা হয়, যা চা-বাগানের ভাষায় ‘প্রনিং’ নামে পরিচিত। এ ছাড়াও প্রতিটি চা গাছের গোড়ার চার ধারে ফুট দেড়েকের গর্ত খুঁড়ে তা থেকে বেছে বেছে বার করা হয় শামুকজাতীয় এক প্রকার প্রাণীকে, যে কাজটিকে বলা হয় ‘থালি’। চা গাছ ছাঁটার পর সেগুলির কাণ্ড চট দিয়ে ভাল করে ঘষে ফেলা হয়, যাতে সহজেই নতুন পাতা আসতে পারে। এই কাজটিকে বলা হয় ‘স্যানিটেশন’। এ ছাড়াও ছায়াগাছগুলির গোড়ায় দেওয়া হয় চুন। মাটির পিএইচ ভ্যালু বজায় রাখতে মেশানো হয় ডলোমাইট। এইসব পরিচর্যার পাশাপাশি রয়েছে কৃত্রিম জলসেচের মতো ব্যয়বহুল অথচ অপরিহার্য কাজকর্ম। চা-মহল সূত্রে জানা গিয়েছে, এসব কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নগদে কিনতে হয়। শীতকালীন পরিচর্যায় শ্রমিকদের ওভারটাইম বা নির্ধারিত সময়ে বেশি কাজ করানোটাও বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। তাই যে মজুরি দিতে হয়, সেটা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নগদে দেওয়াই চা-বাগিচার দস্তুর। টাকার অভাবে প্রনিং-এর কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল ডুয়ার্সের বাগিচাক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ বাগানই এই সমস্যা থেকে এখনও বার হয়ে আসতে পারেনি। যেমন কুর্তি চা-বাগানের ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা গেল, শীতকালীন পরিচর্যার জন্য প্রতি সপ্তাহে নগদ প্রয়োজন প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। অথচ ব্যাঙ্ক থেকে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে মিলেছে ৫০,০০০। কুর্তির ম্যানেজার রাজেশ রুংটা জানান, এমন পরিস্থিতি প্রায় সব বাগানেই। নগদের অভাবে শীতকালীন পরিস্থিতিতে বাগানের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন হয়েছিল। অতি কষ্টে তা সামাল দেওয়া গিয়েছে। চ্যাংমারির ম্যানেজার দেবেন্দ্র সিং পারমার জানান, ৮,০০০ শ্রমিকের বাগানটিতে সপ্তাহে নগদের প্রয়োজন ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা। অথচ মিলছে ৫০,০০০। বাধ্য হয়ে চ্যাংমারি বাগান কর্তৃপক্ষ শীতকালীন কাজের খরচ নগদে না করে চেকের মাধ্যমে করেছেন। শ্রমিকদের এই কাজের ওভারটাইমে পাওনাও চেকের মাধ্যমে মেটাতে হয়েছে এবং ওই চেক নিয়ে তা ভাঙাতে শ্রমিকরা বিপাকে পড়েছে।

এগিয়ে এসেছে পঞ্চায়েত দপ্তর

তবে চা শ্রমিকদের একশো দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে চা গাছের পরিচর্যা বা প্রনিং করে রুগ্‌ণ এবং পরিত্যক্ত বাগান বাঁচানোর উদ্যোগগ্রহণের লক্ষ্যে নবগঠিত চা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠী বাগানগুলিকে বাঁচানোর প্রয়াস গ্রহণ করেছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং নবগঠিত চা সংক্রান্ত মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্য। তাই রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের কাছে সরকারিভাবে এই প্রস্তাব এলে বিষয়টি পঞ্চায়েত দপ্তরের অনুমোদন পেতে পারে। মন্ত্রীগোষ্ঠীর আমন্ত্রিত সদস্য তথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী জানা গেল, রাজ্যের শ্রম এবং সমবায় দপ্তরের অনুমোদন পাওয়ার পর জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ধরণিপুর, রেড ব্যাঙ্ক এবং সুরেন্দ্রনগর চা-বাগানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে আইনগত কোনও বাধা নেই। সৌরভবাবু যেহেতু জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তাই পদাধিকারবলেই ধরণিপুর, রেড ব্যাঙ্ক এবং সুরেন্দ্রনগর চালাতে সমবায় ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তা না দেবার কোনও কারণ নেই। বাগানগুলিতেও খোলা হচ্ছে সার্ভিস কোঅপারেটিভ। এই তিনটি বাগান ধরলে রাজ্যের তিন জেলায় অর্থাৎ আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় বন্ধ, রুগ্‌ণ এবং পরিত্যক্ত বাগানের সংখ্যা ৪২। বাগানগুলিকে ১০০ দিনের কাজের মধ্যে যুক্ত করতে পারলে চা গাছের পাতা পরিচর্যার কাজে, পাতা ছাঁটা অর্থাৎ পরিচর্যা বা প্রুনিং করতে না পারলে নতুন পাতা গজাবে না, ফলে বাগান নষ্ট হবে। পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে ১০০ দিনের কাজে বাগানগুলির শ্রমিকদের যুক্ত করতে পারলে অনায়াসেই বাগানগুলি বাঁচবে।

ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত চা-বাগিচা শ্রমিক, মালিক, সরকারপক্ষ, সাধারণ মানুষ আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান। সাপ-লুডো খেলার মতোই উঠছে-নামছে বাগানগুলির পরিষেবার মান। আশা-নিরাশা, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্যেই বাগিচা শ্রমিকগুলির প্রতিদিনের পথ চলা। ‘এখন ডুয়ার্স’-এর ধারাবাহিক পাক্ষিক প্রতিবেদনগুলি এবং ক্ষেত্রসমীক্ষার রিপোর্ট যখন প্রকাশিত হয়, তখন কোনও কোনও সময় দেখা যায়, আরও অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে অতি দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে, আর এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলকে।

ছবি: সাত্যকি বিশ্বাস

ডুয়ার্সের গ্রামীণ ঐতিহ্য খড়ের ঘর বিলুপ্তির পথে

ডুয়ার্সের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ খড় এবং খড়ের ব্যবহার এখন বিলুপ্তির পথে। ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন ঐতিহ্যশালী খড়ের ঘর বা চালাঘর এখন আর নেই বললেই চলে। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন খড় বা খড়ের ঘর ছাড়া ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চল বা চা-বাগানের কথা ভাবাই যেত না। ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ও রুজি-রোজগারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল এই খড় বা খড়ের তৈরি বাড়িঘর। ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের বসবাসই ছিল চালাঘরের তলায়। খড়ের তৈরি চালাঘরের নিচেই ছিল মানুষের জীবনযাপন, ঘরসংসার, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি। ডুয়ার্সের অধিকাংশ চা-বাগানের শ্রমিকের কোয়ার্টারগুলোতে ছিল খড়ের তৈরি চালাঘর। সাধারণত গ্রামাঞ্চলের ও চা-বাগানের বসবাসের এ খড়ের ঘরগুলো ছিল দু'চালার। গ্রামাঞ্চলে যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন বা শৌখিন, তাঁরা এই খড়ের ঘরগুলোকে চারচালা বা নানারকম নকশা করে নির্মাণ করতেন। আবার কেউ কেউ বাঁশ ও খড় দিয়ে দোতলা ঘর নির্মাণ করে বসবাস করতেন। এই বিভিন্ন রকমের খড়ের ঘর গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্যই শুধু নয়, ঐতিহ্যশালীও বটে।

খড় ও খড়ের ঘর ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের জনজীবনে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে, গানে, কবিতায়, ছড়ায়, কথায়, গল্পে, প্রবন্ধে এই খড় ও খড়ের ঘর বা চালাঘরের উল্লেখ পাওয়া যায়। চালাঘরকে নির্বাচনী প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণপুরুষের বিরহে আলুলায়িতা যুবতীর মানসিক অবস্থাকে বর্ষার জলে ভরা নদীর উথালপাতাল অবস্থার সঙ্গে তুলনা

করে ভাওয়াইয়া গীতিকার লিখেছেন— এলুয়া কাশিয়ার ফুল নদী হইসে মোর হুলুস্থুলু রে... উত্তরবঙ্গে এ ভাওয়াইয়া গানটি খুবই জনপ্রিয়। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাওয়া গিয়েছে, 'খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে, আনল যত চাষীর মেয়ে'।

ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গে যে খড় ব্যবহার করা হত, সেগুলো 'কাশিয়া বা ভাব্‌নী', 'এলুয়া' প্রভৃতি নামে পরিচিত। এ ছাড়া আরেকটি প্রজাতির খড় হল 'বিন্না'। ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলেও চা-বাগানের শ্রমিক কোয়ার্টার নির্মাণের কাজে সাধারণ 'ভাব্‌নী' (কুশ বা কাশিয়া) খড়েরই ব্যবহার হত সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া ঘরের চালা, ছাউনি ও বেড়ার কাজে 'এলুয়া' খড় ব্যবহার করা হত। 'এলুয়া' খড়ের ছাউনি অপেক্ষাকৃত বেশি মজবুত। 'বিন্না' খড় ব্যবহার করা হয় সাধারণত ঝাড়ু তৈরির কাজে। এখন এ সবকিছুই অতীত। চা-বাগানে শ্রমিকদের কোয়ার্টার নির্মাণের কাজে আগে খড়ের বিপুল চাহিদা ছিল। আর এ চাহিদা মেটানোর কাজে খড় সরবরাহ করে অনেকের রুজি-রোজগার চলত। বন বিভাগের আয়ত্তাধীন খড়বনের পারমিট দেওয়া হত এই সরবরাহকারীদের। তারা বন বিভাগের নির্দিষ্ট রয়্যালটি জমা দিয়ে খড় কেটে চা-বাগানে সরবরাহ করত। খড় কাটা ও তা সরবরাহ করার কাজেও যুক্ত ছিল বহু মানুষের জীবন ও জীবিকা। শুধু তা-ই নয়, একটা সময় ছিল যখন এ খড়বনগুলো খরগোশ, বেজি, শিয়ালসহ ছোট ছোট প্রাণী, পাখি ও বিভিন্ন প্রজাতির কীটপতঙ্গের নিরাপদ আস্তানা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এমনকি এ খড়বনে হরিণের দলও চড়ে বেড়াত। এখন আর তা নেই।

ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চল, বনাঞ্চল ও নদীতীরে বিপুল পরিমাণ খড় উৎপন্ন হত। বনাঞ্চলে কিছু কিছু স্থানে এখনও কিছু খড়ের দেখা মিললেও বনাঞ্চলের বাইরে গ্রামাঞ্চল ও নদীতীরের খড়বন এখন আর তেমনভাবে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খড়বন ছোট ছোট চা-বাগানে পরিণত হয়েছে অথবা নদীতীরের খড়বনের জমিতে গড়ে উঠেছে জনবসতি। ফলে ক্রমে ক্রমে সংকুচিত হয়েছে খড়বন। এমন একটা সময় ছিল যখন গ্রামাঞ্চল ও খড়বনে শরৎকালে ফুল ফুটত, তখন গোটা ডুয়ার্স এই কাশ ফুলের শুভ্র সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আগে ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে খড়ের প্রতি যে আকুতি ও আকর্ষণ ছিল, এখন আর তা নেই। কারণ খড় ও খড়ের ঘর এখন বিলুপ্তির পথে। এই অবলুপ্তির কারণ হিসাবে প্রধানত যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে, তা নিম্নরূপ—

১। সামাজিক অগ্রগতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ মানুষের রুচিগত পরিবর্তন এর প্রধান কারণ। খড়ের ঘরের বদলে টিনের ছাপরা বা টিনের চালার নিচে বসবাস করাটা এখন মানুষের বেশি পছন্দ।

২। ইন্দিরা আবাস যোজনা ও গীতাঞ্জলি গৃহনির্মাণ প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে বহু গরিব মানুষের গৃহনির্মাণ হওয়ায় খড়ের ঘরের বিলুপ্তি ঘটেছে।

৩। খড়ের ঘর নির্মাণ করা হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় বাঁশ কিনে খড় দিয়ে ঘর বানাতে যে পরিমাণ খরচ হয়, সেই টাকা দিয়ে অনায়াসে টিন দিয়ে কমপক্ষে একটি ছাপরা ঘর নির্মাণ করা সহজ এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই খড়ের ঘর তৈরির প্রতি গ্রামাঞ্চলের মানুষের অনীহা দেখা দিয়েছে।

৪। পূর্বের ন্যায় সহজে ও সুলভ মূল্যে খড় পাওয়াও খুব কঠিন হয়ে উঠেছে, কারণ খড়বন এখন সংকুচিত।

৫। চা-বাগানে শ্রমিকদের পাকা কোয়ার্টার নির্মিত হয়েছে।

উল্লিখিত কারণে ডুয়ার্সের গ্রামাঞ্চলে ও চা-বাগানে চালাঘর বা খড়ের ঘরের অবলুপ্তি ঘটেছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মত প্রকাশ করেছেন। এখন যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তা হল, ডুয়ার্স এলাকায় আগত পর্যটকদের কাছে ডুয়ার্সের বন-বন্য প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদির পাশাপাশি ডুয়ার্সের নদীতীরে ছড়িয়ে থাকা কাশবন বা খড়বন ও তার সৌন্দর্যও সমানভাবে আকর্ষণীয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডুয়ার্সকে পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার কাজে নানারকম পরিকল্পনা গ্রহণ করছে ও করেছে। ডুয়ার্সের নদীতীরে বা বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে এখনও যেটুকু খড়বন বা কাশবন বেঁচে আছে, সেটুকুকে সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে ডুয়ার্সের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই খড়কে বাঁচিয়ে রাখার সদর্থক কর্মসূচি সরকারিভাবে গ্রহণ করা হোক, সেটাই কাম্য।

পরাণ গোপ

ছবি: নীলাঞ্জনা সিনহা

মহিলাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে জোর দিচ্ছে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি

নির্মল বাংলা গড়তে সাধারণ মানুষের পাশে যেমন দাঁড়িয়েছে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতি, তেমনই এলাকার মহিলাদের সাহায্য করতেও তারা এগিয়ে এসেছে বলে জানালেন শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কৃষ্ণকিশোর রায় সিংহ। জানালেন, এখানে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে প্রায় ৮৭ শতাংশ মহিলা কাজ পেয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প এখানে ১০০ শতাংশ সফল। এই সমিতি থেকে প্রায় ১১০০ জন K2 বেনিফিশিয়ারি রয়েছে, তারা ২৫,০০০ টাকা করে পাচ্ছে। PMAY-তে যে ঘর দেওয়া হচ্ছে, তা-ও মহিলাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে। 'সবুজ সাথী' প্রকল্পে গাছ দেওয়া হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলাদের নিয়মিত চেক-আপ করানো হচ্ছে, তাদের নির্দিষ্ট ভ্যাক্সিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানো চলছে।

এসবের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যদি দেখি, বরমরিচা পিএসসি-তে নতুন হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। এখানকার হেল্‌থ সেন্টারে যে ডাক্তার রয়েছেন, তাঁরাও যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন বলে জানালেন সেখানকার বিডিও অঞ্জন চৌধুরী। বললেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে, সব ক'টাই নিয়ম মেনে এখানে করা হচ্ছে। যেমন— BADP, MGNRE– MSDP, NREGS, বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা যা পাওয়া যাচ্ছে, তার সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির অফিস চত্বরের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে একটি কমিউনিটি হল। ছিটমহলে দুটো কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা করে।

যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। BADP থেকে ৪ কিলোমিটার বিটুমিন রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, এতে খরচ পড়ছে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। প্রায় ২০ কিলোমিটার গ্রাভেল রোড তৈরি করা হচ্ছে অন্যান্য ফান্ড থেকে। এ ছাড়াও মহিষমারিতে একটা জয়েজ ব্রিজ করা হয়েছে।

শীতলকুচিতে ২৯৩টি স্যাংশন অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার থাকলেও তার মধ্যে কাজ হয় ২৮৬-টিতে। অ্যাডিশনাল ক্লাসরুমের কাজ চলছে অনেকগুলো জায়গায়। NRGES থেকে ৯টি সেন্টারের জন্য এবং RIDF থেকে ১৭টি সেন্টারের জন্য ঘর করে দেওয়ার কাজ চলছে। এগুলো হয়ে গেলে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের জন্য আর কোনও ঘরের অভাব থাকবে না।— জানালেন সভাপতি কৃষ্ণকিশোরবাবু। বললেন, ইতিমধ্যেই দুটো স্কুলের জন্য হস্টেল তৈরি হয়েছে MSDP থেকে। একটি শীতলকুচি হাই স্কুল, অন্যটি নগর ডাকালিগঞ্জ হাই স্কুল। বড়মরিচা হাই স্কুলে মেয়েদের একটি হস্টেল হচ্ছে। স্কুলের টয়লেট, রান্নাঘর ইত্যাদি পরিষ্কার রাখার জন্য শুচি শিক্ষাঙ্গন প্রকল্প চালু হয়েছে। ১২,০০০ পরিবারকে NREGS-এর তরফ থেকে ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট স্কিম দেওয়া হচ্ছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

দেবপ্রসাদ রায়

।।২৬।।

জাতীয় রাজনীতি কঠিন ঠাঁই, তা ক্রমশ টের পাচ্ছেন লেখক। তদুপরি গোষ্ঠী রাজনীতি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজেকে উন্নীত করার চাপ। যুব কংগ্রেসের হয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে গিয়ে কতটা সফল হওয়া যাবে? দেখা যাচ্ছে যে, দলের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে লেখক ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন করতে শুরু করেছেন বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃত্বের। দুটো রাজ্যে লাভ হল আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। পন্ডিচেরিতে যুব সভাপতি বললেন মূল্য দেওয়ার কথা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ডি পি রায় ভেবে মালা পরানো হল অন্য কাউকে। তারপর জানাজানি হতে যা ঘটল তা ভারী বিচিত্র। আগ্রহ জাগানো আরও এক কিস্তি।

মাত্র দু'বছর গুলাম নবি যুব কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে কাজ করেছে। আমার কখনও মনে হয়নি, ও কোনও প্রতিভাবান যুবনেতা। ক্রিকেট টিমে যেমন এক একজন 'ইউটিলিটি প্লেয়ার' থাকে, রাজনীতিতে গুলাম নবিকে আমরা তেমনি একজন 'ইউটিলিটি পলিটিশিয়ান' বলে মনে হয়েছে। এবং সেই কারণে আজও ও কংগ্রেস রাজনীতিতে নিজেকে প্রাসঙ্গিক করে রাখতে পেরেছে। কোনও বিশেষ কাজে পারদর্শী নয়, কিন্তু সব কাজই সামলে নিতে পারে। ও বুঝতে পেরেছিল, দলকে কর্মসূচির ভিতর রাখতে হবে। তাই দু'বছরের ভিতরই এমন কতকগুলি প্রোগ্রাম নিতে পেরেছিল, যা তার পরবর্তীতে কেউ পুনরাবৃত্তি করে দেখাতে পারেনি। এবং একটা চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে ওকে শুরু করতে হয়েছিল।

'৭৭ থেকে '৮০-র নির্বাচন পর্যন্ত যুব কংগ্রেস বস্তুতপক্ষে সঞ্জয়জির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। তাঁর অনুগামীদের বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কিন্তু তাঁর নাম ব্যবহার করে মানেকাকে সামনে রেখে যে বিভাজনের রাজনীতি শুরু হয়েছে, তাকে 'প্রি-এম্প্‌ট' করতে হবে। এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তাই প্রথম বড় প্রোগ্রাম হিসেবে দিল্লির আজমল খাঁ পার্কে সঞ্জয়জির জন্মদিন ১৪ ডিসেম্বর এক বড় যুব সমাবেশ করে বার্তা দিতে হল, সঞ্জয় গান্ধি মৃত্যুর পরেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাননি। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে যে রাজনীতি মানেকা গান্ধি করতে চাইছেন, তাতে কংগ্রেসের কোনও সমর্থন নেই।

আমার হিন্দি তখনও অত্যন্ত দুর্বল। মঞ্চে যেখানে ইন্দিরাজি আছেন, অরাজনৈতিক পোশাকে রাজীবজি আছেন, সেখানে হিন্দি বলার সাহস দেখালাম না। অল্প বললাম, কিন্তু ইংরেজিতে বললাম। পরে শুনেছি, ইন্দিরাজি নাকি গুলাম নবিকে বলেছিলেন, 'ও হিন্দিতে বলছে না কেন?' উত্তরে গুলাম নবি বলেছিলেন, 'ও এখনও হিন্দিটা রপ্ত করে উঠতে পারেনি।' যদিও রথের প্রশ্নে ইন্দিরাজি বিরক্ত বোধ করেছিলেন, কিন্তু আজমল খাঁ পার্কে রাজীবজিকে নিয়ে মঞ্চে আসাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যাঁরা বোঝদার, তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন, ইন্দিরাজি কী চাইছেন। তাই আমরা যারা যুব কংগ্রেসের পদাধিকারী ছিলাম, তারা ধীরে ধীরে রাজীবজির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করে, ওঁকে যুব কংগ্রেসের হালহকিকত নিয়ে একদিকে যেমন অবহিত করতাম, তেমনি উনি কিছু বলতে চাইছেন কি না তা-ও বোঝবার চেষ্টা করতাম।

আমরা যতদিন যুব কংগ্রেসে ছিলাম, সংবিধান, সদস্যীকরণ— সবই ছিল। কিন্তু আজকের মতো নির্বাচনে কোনও প্রক্রিয়া ছিল না। তখন যুব কংগ্রেস দলকে বেশি শক্তি জোগাতে পেরেছে না আজকে পারছে— সেটা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যাঁরা গভীরভাবে আলোচনা করবেন, তাঁরাই বলতে পারবেন। তবে আমার মনে হয়েছে, কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্যগুলিতে ভারসাম্য রেখে সে সময়ে যুব কংগ্রেস চলত বলে, দলের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যুব শাখা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আবার কাজটা কঠিনও ছিল। কারণ সব রাজ্যেই ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী চাইত যুব

কংগ্রেসকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। বিশেষ করে যে রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসি সরকার ছিল, সেইসব জায়গার মুখ্যমন্ত্রীরা চাইতেন, তাঁর মনোনীত প্রার্থীই যেন দায়িত্ব পান। ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থেকে, প্রলোভনকে উপেক্ষা করে যোগ্য প্রার্থীকে চিহ্নিত করা সহজ কাজ ছিল না। আমার মনে আছে, আমায় প্রথম এই দায়িত্ব পালন করতে মধ্যপ্রদেশ যেতে হয়েছিল। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি সি শেঠি— কেউই কম প্রভাবশালী ছিলেন না। আজকের দিগ্বিজয় সিং তখন যুব শাখার সাধারণ সম্পাদক। বয়সের কারণে ভ্রমর লাল পোরতের পরিবর্তে নতুন কাউকে আনতে হবে। আর বয়স যেন কোনও অবস্থাতেই পঁয়ত্রিশের বেশি না হয়।

অর্জুন সিং, পি সি শেঠি ও বিদ্যাচরণ শুক্লা— সকলেরই প্রার্থী আছে। তাই এই তিন প্রভাবশালী দাবিদারকে শান্ত রাখতে এবং যুব কংগ্রেসকে গোষ্ঠী রাজনীতির শিকার হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে নিরপেক্ষ প্রার্থী উত্তম খটিককে মনোনীত করা হল। এই কাজটি করার ক্ষেত্রে আমার দূরদর্শিতা ও নিরপেক্ষতার উপর ধীরে ধীরে গুলাম নবির এতটাই আস্থা গড়ে উঠেছিল যে, আমি একসময়ে গোলোটা রাজ্যে যুব সভাপতি নির্বাচিত করতে পেরেছিলাম। তাদের ভিতর ভুবনেশ্বর কলিতা, কে জে জর্জ, থাঙ্গাবালু, হনুমন্ত রাও, সুরেশ পাচৌরিরা পরবর্তীতে কেউ কেউ রাজ্যস্তরে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। দু'-একটি বিতর্কিত ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না।

কর্ণাটকে গুন্ডু রাও তখন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে যদিও উনি চাপ সৃষ্টি করছেন, ওঁর প্রার্থীকে দায়িত্ব দিতে হবে। দিল্লি চাইছে, নিরপেক্ষ কেউ আসুক। তাই পর্যবেক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুলাম নবিকে সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হল। যখন আমার নাম উত্থাপিত হয়েছে, কেউ একজন বলেছে, ও আবার টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে না তো? গুলাম নবি পরে আমায় জানিয়েছিল যে, ও তার প্রত্যুত্তরে বলেছে, ডি পি-কে এক কোটি টাকা দিলেও কেনা যাবে না।

তবে এর জন্য আমাকে অনেক মাশুল গুনতে হয়েছে। তামিলনাড়ুর অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন জি কে মুপানর। বিভাজনের পরে '৭৭ সালে, ২৪ আকবর রোডে যে কংগ্রেস (ই) সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়, সেই বাংলোটা ছিল রাজ্যসভা সদস্য মুপানারজির নামে আবণ্টিত। তাই ওঁর প্রভাব কখনওই উপেক্ষা করার মতো ছিল না। আমি যখন চেন্নাই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, উনি

কর্ণাটকে গুন্ডু রাও তখন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে যদিও উনি চাপ সৃষ্টি করছেন, ওঁর প্রার্থীকে দায়িত্ব দিতে হবে। দিল্লি চাইছে, নিরপেক্ষ কেউ আসুক। তাই পর্যবেক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুলাম নবিকে সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হল। যখন আমার নাম উত্থাপিত হয়েছে, কেউ একজন বলেছে, ও আবার টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যাবে না তো? গুলাম নবি পরে আমায় জানিয়েছিল যে, ও তার প্রত্যুত্তরে বলেছে, ডি পি-কে এক কোটি টাকা দিলেও কেনা যাবে না।

আমাকে ডেকে পাঠালেন। যদিও বললেন নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে, পাশাপাশি এটাও বলতে ভুললেন না, সুন্দরমূর্তি সভাপতি হলে তিনি খুশি হবেন। কিন্তু তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমার মনে হল, থাঙ্গাবালুকে সভাপতি নির্বাচিত না করলে দলের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই যখন থাঙ্গাবালুর নাম ঘোষণা করা হল, মুপানারজি ডেকে বললেন, আমার রাজ্যে অশান্তি বাড়িয়ে দিয়ে তোমার কী লাভ হল? আমি নীরব রইলাম। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাঙ্গাবালু প্রমাণ করেছিল, সে দিন আমার সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না।

পন্ডিচেরির অভিজ্ঞতা চমকপ্রদ। দীর্ঘদিন ফরাসি উপনিবেশ থাকার কারণে ওখানকার লোকদের একটা সুবিধা আছে। ইংরেজি না জানলে স্বচ্ছন্দে বলে দেয়, 'আই স্পিক ফ্রেঞ্চ।' ওখানকার একমাত্র এম পি সম্মুগম ছিলেন এই গোষ্ঠীর একজন। ওঁর খুব ইচ্ছা ছিল, ওঁর রাজ্য যুব সভাপতি যেন ওঁর মনোনীত কাউকে করা হয়। ব্যাচেলর মানুষ। একা থাকতেন। আমি পন্ডিচেরি যাব শুনে অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। তখনও আমরা ২৪, আকবর রোডে এক কামরায় বসে অফিস চালাই। আমি বললাম, আপনি তো একা। তাহলে বাংলোটা যুব কংগ্রেসের অফিস করতে দিন না। উনি সাগ্রহে রাজি হয়ে বললেন, কোনও ব্যাপার নয়, আপনারা আমার নামে বাড়ি নিন, শুধু আমার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। আমি বললাম, সে আর বলতে!

২১, জনপথ রোডে বাংলো নেওয়া হল। যুব কংগ্রেসের আলাদা অফিস হল। আমিও পন্ডিচেরি গেলাম। সম্মুগম যাকে চাইছেন, সে একা এসে দেখা করে গেল। আর যাকে চাইছেন না, সেই কান্নানের সমর্থন এত জোরালো যে, আমাকে ওর নাম সভার ভিতরেই ঘোষণা করতে হল। ও পরে রাজ্যের স্পিকার ও রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিল। সব যখন মিটে গিয়েছে, রাতে গেস্ট হাউসে খাবারের অপেক্ষা করছি, কান্নান এল। বারবার বলতে লাগল, সব ঠিক আছে কি না। আমি বললাম, সবই তো ঠিক হয়ে গেল। তোমার নাম তো এখানেই ঘোষণা করে দিলাম। আর কী বাকি থাকল? ও বলল, আমার কিছু করণীয় আছে কি! আমি বললাম, তার মানে? ও তখন খোলসা করে বলল, ক'দিন আগে এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক হেনরি অস্টিন পর্যবেক্ষক হয়ে এসেছিলেন; পিসিসি-র পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবার দায়িত্ব নিয়ে। কমিটিতে তারাই স্থান পেয়েছে, যারা ওঁকে আর্থিক মূল্য দিতে পেরেছে। কমে পাঁচ হাজার, উপরে দশ হাজার। তাই আমার আজকের ঘোষণার জন্য ওকে কোনও মূল্য দিতে হবে কি না। আমি বললাম, একটাই মূল্য দিতে হতে পারে যে, আমি কাল সকালে প্রেসকে ডেকে বলব, আমার ঘোষণা প্রত্যাহার করে নিলাম। ও একদম পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, আমার আপনাকে চিনতে ভুল হয়েছে, মাফ করে দিন।

আমার ঘোষণা দেখে সম্মুগম রেগে কাঁই। উনি এসে ক্ষোভ জানাতেই আমি কঠিন ইংরেজি বলতে শুরু করায় উনি রণে ভঙ্গ দিলেন। বাড়িও গেল, যুব কংগ্রেসও গেল। জানি না, পরে আমাকে কত অভিশাপ দিয়েছে!

অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনা মনে করার মতো। রাজ্যে দল ক্ষমতায়। তাই প্রতিযোগিতাও কঠিন। অনেক দাবিদার। তাই এয়ারপোর্টেও কয়েক হাজার যুবকর্মীদের ভিড়। আমার ফ্লাইট লেট ছিল। ইতিমধ্যে দিল্লির এক বিমান পৌঁছেছে। তাতে একটা সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বসন্ত সাঠে নেমেছেন। নইম বলে একজন কংগ্রেস কর্মী ওঁকে চিনতে পেরে একটা মালা পরিয়ে দিয়েছে। আর হাজার জনতা 'ডি পি রায় জিন্দাবাদ' বলে সব মালা ওঁর গলায়! অনেক কষ্টে উনি যখন বলতে পেরেছেন উনি ডি পি রায় নন, তখন নিমেষের মধ্যে ওঁর গলা থেকে সব মালা তুলে নিয়ে জনতা উধাও। এ গল্প পরে আমার মিডিয়ার কাছ থেকে শোনা। স্থানীয় সংবাদপত্রে পরদিন ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল। *(ক্রমশ)*

আমবাড়ি পিকনিক স্পট ও দমদমা ঝিল তৈরি পর্যটকের জন্য: সৌজন্যে মাথাভাঙা-১ পঞ্চায়েত সমিতি

আমবাড়ি পিকনিক স্পট। নিচে সভাপতি আবু তালেব আজাদ

রাজ্য জুড়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়নের জোয়ারে শামিল হয়েছে মাথাভাঙা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতি। সমিতির সভাপতি আবু তালেব আজাদ জানান, শুধু রুরাল কমিউনিকেশনের উন্নতি বা স্বাস্থ্য নয়, আরও বহুবিধভাবে এই ব্লকের উন্নতির জন্য আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সবরকম স্কিমের সঠিক প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আমাদের এলাকায় দুটো বড় প্রজেক্টের কাজ চলছে। এগুলো তৈরি হয়ে গেলে আগামী দিনে এই দুটো আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির কাছে যেমন অ্যাসেট হয়ে থাকবে, তেমনই ব্লকটাও পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নেবে।

একটা হচ্ছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে দমদমা ঝিল, শিলিগুড়ি হাইওয়ের পাশে। অন্যটি হাজরাহাট জিপি-তে আমবাড়ি পিকনিক স্পট ও পর্যটনকেন্দ্র। দমদমা ঝিলে ৫ কোটি টাকার কাজ চলছে। সেখানে পিকনিক স্পট, টুরিস্ট স্পট, কমিউনিটি হল, পার্কিং থেকে শুরু করে অনেক কিছু তৈরি করা হবে। বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ প্রায় শেষের দিকে। আশা করছি, আগামী বছর থেকে এটা চালু করে দিতে পারব।

আবু তালেববাবু আরও জানান, আমবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ওখানে আমাদের ৩০ একর, প্রায় ৯০ বিঘা জমি রয়েছে। সুটুঙ্গা নদীটি সরে যাওয়ায় সেখানে একটা বিশাল চর পড়েছিল। সে সময় সেখানে অনেক গাছও লাগানো হয়েছিল। সেগুলো বড় হয়ে এখন একটা খুব সুন্দর প্রাকৃতিক বনের আকার নিয়েছে। জায়গাটির তিন দিক নদী-ঘেরা।

এর খুব কাছেই মাথাভাঙা রেলওয়ে স্টেশন চালু হয়েছে। এখানের সৌন্দর্যায়নের জন্য জেলা পরিষদ ৯৬ লক্ষ টাকা প্রাথমিক পর্যায়ে বরাদ্দ করেছে। তা দিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, ভিতরের চিলড্রেন'স পার্কের ফেন্সিং আর খেলনা দোলনা ইত্যাদি বসানো হচ্ছে।

দমদমা ঝিল

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার রাস্তার কাজ শুরু করেছে। হাজরাহাট থেকে ওখানে ঢোকার রাস্তা ও ভিতরের ফুটপাথ করার কাজ চলছে। ওখানে ভিতরে বসে গল্প করা, আড্ডা মারা ছোট ছোট শেড তৈরি করে দিয়েছে জেলা পরিষদ। টয়লেট তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ কাজ এখনও শেষ হয়নি। তাতেই এ বছর জানুয়ারি মাসে প্রত্যেকদিন প্রায় ৫০ থেকে ১০০টা পিকনিক পার্টি এসে পিকনিক করে গিয়েছে। সকলে খুব প্রশংসাও করেছে জায়গাটার। আগামী দিনে আমরা ঠিক করেছি, একটা এন্ট্রি ফি নেব। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পরবর্তীতে আরও টাকা দেবে। তা-ই দিয়ে ওখানে একটা বড় মিটিং হল, কমিউনিটি হল করা হবে, যেখানে ব্লক বা জেলার বিভিন্ন মিটিং করা যাবে। এ ছাড়াও একটা গেস্ট হাউস করার কথা চিন্তা করা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। কারণ পদাতিক এক্সপ্রেস মাথাভাঙা দিয়ে আসার ফলে অনেক মন্ত্রী, এমএলএ এখান থেকে যাওয়া বা আসার সময় উঠতে পারবেন। এই ধরনের উন্নতির ফলে জায়গাটি খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফসলের গোলা, কিষান মান্ডি, আদর্শ গ্রাম, আইটিআই কলেজ— উন্নয়নই মাথাভাঙা-২ পঞ্চায়েত সমিতির লক্ষ্য

উপরে আদর্শ গ্রাম, পাশে— উপরে সেলফ্ হেল্প গ্রুপ, নিচে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি কৃষকদের সুবিধার দিকেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মাথাভাঙা-২ নং পঞ্চায়েত সমিতি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানান প্রকল্পর সুবিধা যাতে কৃষকভাইয়েরা পায়, সে ব্যাপারে সর্বদা লক্ষ রাখা হয় বলে জানালেন সভাপতি উমাকান্ত বর্মন। বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমলে বিভিন্ন ধরনের স্কিম চালু হয়েছে কৃষকদের জন্য— আমার ফসল আমার গাড়ি, আমার ফসল আমার গোলা, আমার ফসল আমার চাতাল ইত্যাদি। কোনও কৃষক যদি তার ফসল মাঠের থেকে বাড়ি নিয়ে আসতে চায়, তখন তাকে গাড়ি দেওয়া হচ্ছে— এটাই আমার ফসল আমার গাড়ি। আবার সেই ফসল বা ধান যদি সে সংরক্ষণ করতে চায়, তখন তার গোলার দরকার হবে। উমাকান্তবাবু জানান, এই গোলার জন্য দু'ধরনের স্কিম রয়েছে— কাঁচা গোলা ও পাকা গোলা। এ ছাড়াও রয়েছে পারবয়েলিং ইউনিটের সুবিধা। কোনও মহিলা যদি ধান-চালের ব্যবসা করতে চায়, তার জন্য দু'হাজার টাকার স্কিমে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ার পারবয়েলিং ইউনিটের সুবিধা রয়েছে। গত বছর আমাদের এখান থেকে দু'জন মহিলা এই স্কিমটি নিয়েছে, এ বছরও দু'জনের নেওয়ার কথা আছে। এই ব্লক থেকে প্রতি বছর মহিলা সমৃদ্ধি যোজনাতে লোন হচ্ছে। নিশিগঞ্জ ১ ও ২-তে এর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাদের রিপেমেন্ট বেশ ভাল।

এবার আসা যাক কিষান মান্ডির কথায়। লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে কিষান মান্ডি। যদিও এই মুহূর্তে সবজি কেনাবেচায় তারা একটু পিছিয়ে আছে বলে জানালেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমাকান্ত বর্মন। বললেন, এখানে ফালাকাটা ও ঘোকসাডাঙায় বেশ বড় বাজার আছে। আমরা বড় পাইকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যাতে ওরা আসে। প্রথমবার চালু হবার সময় অনেকেই এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পাইকাররা ঠিকমতো না আসায় কৃষকদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। তাদের মাল বিক্রি হয় না বা কম দামে মাল দিতে হয়। এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য ইতিমধ্যেই আমরা বিনয়কৃষ্ণ বর্মনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। জয়গাঁর কয়েকজন পাইকারের সঙ্গে কথাও হয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি এর মধ্যেই সবজি বাজারটা চালু করার। তবে ওখানে নিয়মিত ধান কেনা কিন্তু চলছে। আমরা নিয়ম করে প্রত্যেকটা জিপি-তে দু'দিন করে দিচ্ছি। তাই ধান কেনাবেচায় কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

আইটিআই কলেজ

মাথাভাঙা-২ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে হাই স্কুল রয়েছে বলে জানালেন উমাকান্তবাবু। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, এখন কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষা ছাড়া এখানকার ছাত্রছাত্রীদের আর বাইরে যেতে হয় না। যে যে এলাকার ছেলেমেয়ে, সে সেই এলাকায় পড়াশোনা করতে পারে। মাথাভাঙায় দুটো কলেজ রয়েছে। ফলে তারা বাড়ির ভাত খেয়ে কলেজও করতে পারছে। এ ছাড়াও এ কে পারাডুবিতে আইটিআই কলেজ চালু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাতে ৮টি শাখা খুলেছে, সেখানে ৩৫০ জন মতো ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। এখানে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, হাই স্কুল যতগুলো রয়েছে— কোনওটাতেই কিন্তু ঘরের কোনও অভাব নেই। স্যানিটেশনেরও কোনও সমস্যা নেই বলে জানালেন তিনি।

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোতে হেল্থ সেন্টার রয়েছে। সেখানে ডাক্তার রয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের অভাব রয়েছে। আবার NREGS, RIDF, IFGP ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেরাও করছে, পঞ্চায়েত সমিতিও অঙ্গনওয়াড়ির ঘর করে দিচ্ছে। তবে বাম-আমলে তৈরি হওয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোর বেশ কয়েকটিতে স্থায়ী ঘর নেই। তারা জায়গা দিচ্ছে না, ফলে আমাদের ইচ্ছে থাকলেও ঘর তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না।— বললেন সভাপতি।

নিজস্ব প্রতিনিধি

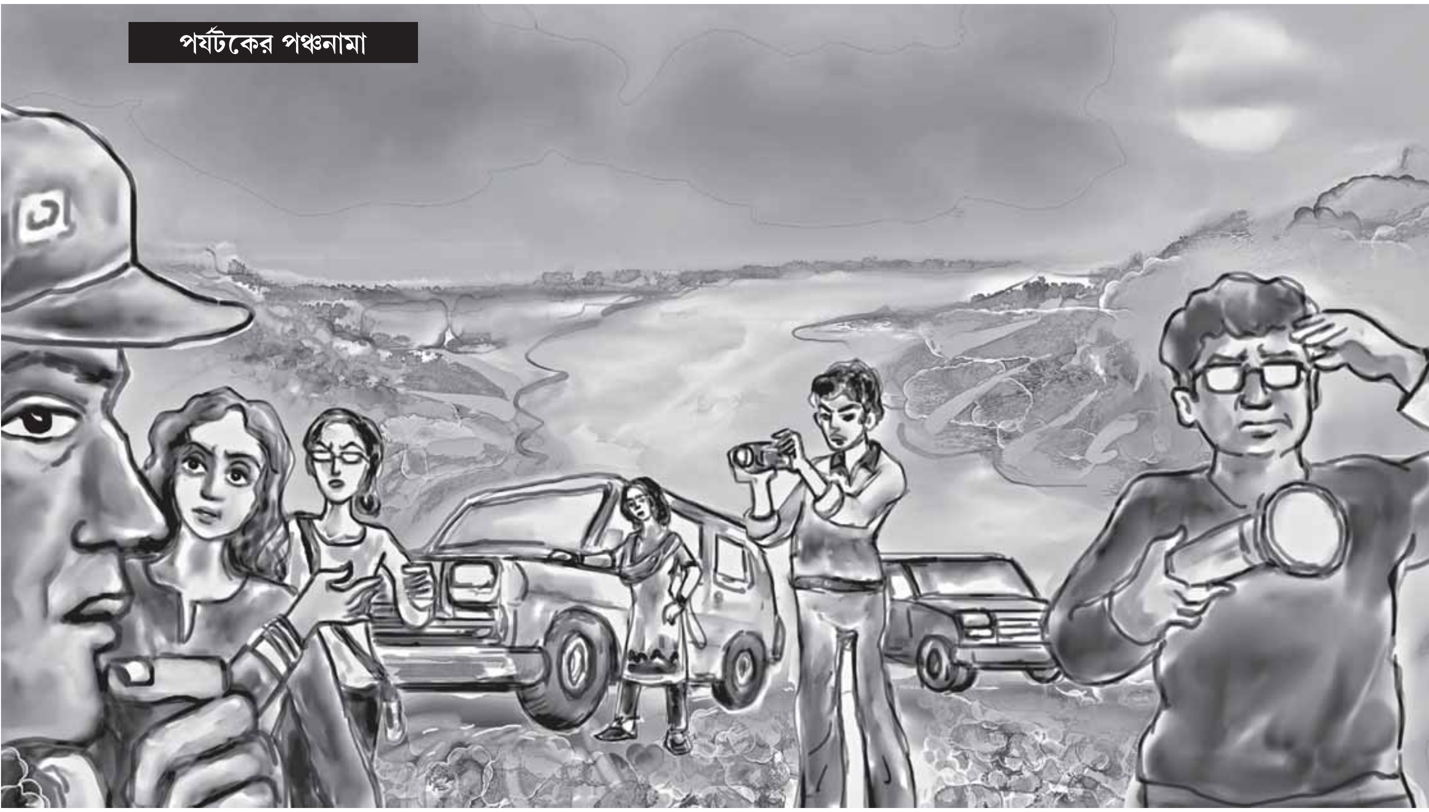

স্কেচ : অভিজিৎ সরকার

অচিন মানচিত্র ও তিন নদী

পরপর বেশ কয়েকটা জোরালো ঘটাং ধ্বনি। ঘটনাটি ঘটল তারপর। আপেক্ষিক বিচারে যেটাকে ঘটনার বদলে দুর্ঘটনা বলা চলে কি না, তা তর্কসাপেক্ষ। তবে নিরপেক্ষ বিচারে বলা যেতেই পারে, এক সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রথম পরিচ্ছদ।

ছেঁড়া মেঘে ঢাকা চাঁদনি রাতে, ডুয়ার্সের একটি শুকনো রিভারবেডে, আমাদের গাড়ি দুটো পথ হারিয়ে জাস্ট থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্ত থেকেই চিন্তায় ফ্যাকাশে হওয়া শুরু করল গাড়ির আরোহীদের মধ্যে অনেকেরই মুখ।

আধ ঘণ্টা আগেও চলছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের হইচই। মাদারিহাট থেকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে আমরা সবে তখন টেটোপাড়া রোডে। গুমগুম করে সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড গুডস ট্রেন ক্রস করার পরে যখন রেল গেট পার হলাম, সন্ধের গায়ে ততক্ষণে আঁধারের সর পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে মিউজিক সিস্টেমের পাশে পাশে গাড়ির হেডলাইটও চালু হয়ে গেল।

মিনিট কুড়ি সে অবস্থায় সাঁইসাঁই করে পিচ রাস্তা ধরে ছোটার পর অবশেষে এক জায়গায় গতি কমিয়ে গাড়ি ডাইনে বাঁক নিল। মসৃণ পিচ রাস্তা ছেড়ে হেলেদুলে নেমে গেল নদীর এবড়োখেবড়ো বেডে। এতক্ষণ যা-ও বা ঘরবাড়ি, ল্যাম্পপোস্টের অল্পস্বল্প আলো চোখে পড়ছিল, এবার একদম কঠিন ঘুটঘুটে আঁধার।

কিন্তু তখনও কারও কোনও টেনশন নেই। কারণ এ তো উদ্দেশ্যহীন অ্যাডভেঞ্চার নয়। ফোনে শোনা একটা স্পষ্ট দিঙ্‌নির্দেশ সম্বল করে আমরা যাচ্ছিলাম লঙ্কাপাড়া ফরেস্ট রেস্ট হাউস অভিমুখে। আর সেই নির্দেশিকায় বলাই ছিল যে, কয়েক কিলোমিটার পথ নদীর বেড দিয়ে যেতে হবে, যে রাস্তাটার যথেষ্ট খারাপ অবস্থা।

কিন্তু, খারাপ বলে খারাপ? খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, পৃথিবীতে আছি না চাঁদের মাটিতে, সেটা বোঝাই দুষ্কর। ফোসকা ফোসকা ক্রেটারের মতো অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন নদীর খাতে। মানে, দিনের বেলায় রোজই ক্ষুধার্ত ট্রাকের দল এখান থেকে টন টন ঝুরো পাথর তুলে নিয়ে যায়। হেডলাইটের আলোকবৃত্তে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ট্রাকের মোটা মোটা চাকার দাগের কাটাকুটি নকশা। আর সেই উঁচুনিচু খাতে অনবরত হোঁচট খাচ্ছে আমাদের মারুতি গাড়ির বেঁটে চাকা। ফলে গাড়ির গতরে মোক্ষম কোনও চোট লাগার সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তখন থেকেই মনে হতে লাগল যে, গাড়ির চেসিস আর স্প্রিং-এর ঘটাং ঘটাং ধ্বনি, ইঙ্গিত দিচ্ছে... যে কোনও মুহূর্তে কিছু একটা যন্তর বিগড়ে গিয়ে গাড়ি নট নড়নচড়ন হয়ে যেতে পারে।

এই গাড়িতে আমরা তিনজন পুরুষ পথপ্রদর্শনের দায়িত্বে। আর পিছনের গাড়িতে চালক বাদে তিনজন নারী এবং একটি শিশু। সেই গাড়ি অল টেরেন এসইউভি গোত্রের। ফলে মারুতির পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও সে তেমন সরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। কিন্তু তা-ই বলে যে একেবারে নিশ্চিন্ত, তা-ও না। আজ সকালে তার আবার একটি অন্য ব্যামো ধরা পড়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ হলেই মাঝে মাঝে আচমকা স্টিয়ারিং লক!

সুতরাং সব মিলে একটা গুপ্ত উদ্বেগ

এবারে মওকা খুঁজছিল। যে মনটা বুঁদ প্রজাপতি হয়ে অ্যাডভেঞ্চার নামক ফুলের মধু আহরণে ব্যস্ত, তাকে ফটাস করে এক তালি মেরে উড়িয়ে দেয়ার মওকা। যেটা মিলে গেল, সামনের নদীখাতে ট্রাকের চাকার যাবতীয় চিহ্ন আচমকা ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যেতে!

অতি অপটিমিস্ট চালকও এই অবস্থায় ব্রেক কষতে বাধ্য। ফলে প্রথমেই যে বর্ণনা দিয়েছি, সেইমতো দুটো গাড়িই থমকে থ। ইঞ্জিনের মৃদু গুনগুন ছাপিয়ে ঝিঁঝিপোকার ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা একদম ফাইভ পয়েন্ট সারাউন্ড সাউন্ড হয়ে ঘিরে ধরল আমাদের। ঝিঁঝিপোকার দল সমস্বরে বলছে, 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

—তুই শিয়োর, রাস্তাটা নদীর বেড দিয়ে?

—একদম শিয়োর।

—মানে, এই নদীটাই তো? আশপাশে আরও নদী থাকে যদি?

—সে তো থাকবেই। ফোনে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে যা কথা হল, তাতে রাস্তাটা দু'জায়গায় নদীর উপর দিয়ে গিয়েছে!

দুই ছায়ামূর্তির আলোচনা চলছে গাড়ির ফ্রন্ট সিটে।

একজন স্টিয়ারিং-এ হালকা তবলা বাজাচ্ছে। সে ডুয়ার্স বিশারদ, নেচার লাভার, অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী এবং ট্রেকার হিসেবে বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী। বস্তুত, এই অঞ্চলের সমস্ত বনবাংলোর কেয়ারটেকাররা এক ডাকে তাকে চেনে। সুতরাং নিশ্চিন্তে তবলা বাজানোর হক আছে তার।

দ্বিতীয়জন আমার কলেজজীবনের বন্ধু। এখন ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের অ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট পদে কোচবিহারে পোস্টেড। সুতরাং মুখ্য প্রশ্নকর্তার ভূমিকায় তাকেও খুব ভাল মানিয়ে গিয়েছে।

পিছনের সিটের এক কোণে আমি। এক কোণে, কারণ বাকি জায়গা জুড়ে ডাঁই করে রাখা আছে বার্ড ওয়াচিং-এর ক্যামোফ্ল্যাজ টেন্ট এবং পেল্লায় জুম লেন্স ফিট করা একটি ক্যামেরা।

ডুয়ার্স বিশারদকে জজসাহেব জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করতে করতে জানালা দিয়ে ইতিউতি প্রাণপণ টর্চও মারছে। কিন্তু তেমন কিছু সমাধানসূত্রে আলোকপাত করতে পারছে না।

আমি, আমার হাতে ধরা খুদে ভিডিয়ো ক্যামেরাটিও এদিক-ওদিক তাক করছি। কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিনে দেখছি, গাড়ির হেডলাইটে আলোকিত যতটা রিভারবেড সামনে, তা একদম সাফসুতরো। ওখান দিয়ে চিরকাল যেন শুধু নদীর জলই বয়ে গিয়েছে। গাড়ির চাকার জন্য বলতে গেলে, একরকম ভার্জিন টেরিটরি।

পিছনের জাইলো গাড়ির দরজা খট করে খুলল এবং ধমাস করে বন্ধ হল। পরমুহূর্তে আমার জানলার পাশে এক রুদ্র নারীমূর্তির আবির্ভাব। আমার স্ত্রী! আমি ক্যামেরা ঘুরিয়ে তাকে ফ্রেমে ধরতেই সে হিসহিসে গলায় ধমকের সুরে বলল, কী ননসেন্সের মতো কাজ করছ তোমরা? নদীতে এখন যদি হড়কা বান আসে?

অনেকক্ষণ থেকেই যে পিছনের গাড়িতে হড়কা বানের সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছিল, তার মোক্ষম প্রমাণ সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। কারণ, পিছন থেকে ভেসে এল শিশুকণ্ঠের ভয়ার্ত কান্না— আমি আর যাবওওও না। আমাকে বাড়ি নিয়ে চলোওওওও...।

বস্তুত, এবারের এই ডুয়ার্স সফরটি, কলকাতা ছাড়ার মুহূর্ত থেকেই খুচরো বিপত্তির ভাইরাস দ্বারা নানাভাবে আক্রান্ত। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, টুকরো টুকরো গণ্ডগোল অভিজ্ঞতায় মশলা যোগ করে। কিন্তু কেউ কেউ আবার সেই একই পরিস্থিতিকে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার অনুঘটক বলে গণ্য করে নেয়।

দম্পতি হিসেবে আমরা তেমনই একটি মুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ। উদাহরণ হিসেবে যেমন ধরা যাক, স্টেশনে রিজার্ভেশন চার্ট বেরনোর মুহূর্তে প্রথম হেঁচকিটির কথা! ওয়েটিং লিস্ট থেকে শেষ মুহূর্তে টিকিট কনফার্ম হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের দুটো বার্থ পড়েছে কম্পার্টমেন্টের একেবারে দু'মাথায়।

—কী ট্রাভেল এজেন্টকে দিয়ে টিকিট করাও? এমন সিট কেউ দেয়? পানিপথের যুদ্ধে প্রথম কামান গর্জন হল!

স্ত্রীরা সবসময়ই পুরুষদের দোষত্রুটির ছিদ্র একদম পিনপয়েন্ট করে নিয়ে গোলাবর্ষণে বিশ্বাসী। এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোনও প্রতিরোধই কার্যকরী নয়। বার্থ কেলেঙ্কারির সেই অমোঘ মুহূর্তে ট্রাভেল এজেন্ট মহাশয়কে যতবারই ফোন করি, তিনি নির্মল সারল্যে ফোন কেটে দেন। ফলে, আমার ভোকাট্টা হওয়ার পথটি একেবারে প্রশস্ত। শিয়ালদহ স্টেশনের অতিকায় শব্দস্রোতের মধ্যেও প্রতিপক্ষের শানিত বাক্যবাণগুলির একটিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে না দেখে, আমি তড়িৎ গতিতে হাঁটা লাগালাম একদম স্টেশনের বাইরে। একটা, দুটো, দশটা... যতগুলো সিগারেট খরচা হয় হোক। আমি বাবা ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে ছাড়া প্ল্যাটফর্মে ফিরছি না!

অবশেষে ট্রেন ছাড়ল, আর আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দুটো সিট দু'জায়গায় তো হয়েছেটা কী? টিটি থেকে সহযাত্রী, সবাইকে অনুরোধ জানিয়েও বার্থ বদলাবদলি করতে ব্যর্থ হয়েছি। তাতেই বা কী? এসব তখন তুচ্ছ ব্যাপার আমার কাছে। যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি! সেই যে একটা বিশাল আনন্দের সুড়সুড়ি, তার ধারেকাছে আর কিছু আসে না। নিত্য রোজকার কর্ম জগতের ছবি-টবি মুছে মন যেন হয়ে গিয়েছে এক বিরাট ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাকবোর্ড। ঠিক শৈশব বয়সের আঁকাবাঁকা অপটু দাগে যেখানে ধোঁয়া-ওড়ানো রেল ইঞ্জিন আর বগির ছবি ফুটে উঠছে। ট্রেনের তালে তালে তাতে শুধু উল্লসিত ক্যাপশনে কুউউ... ঝিকঝিকঝিকটুকু লেখা বাকি।

চলন্ত ট্রেনের সেই মায়াবী ছন্দ ক্রমে সংক্রমিত হল মুদ্রার উলটো পিঠেও। ব্যাজার মুখটি অতি শীঘ্রই সুপারচার্জ হয়ে গেল। বেড়াতে যাচ্ছি-বেড়াতে যাচ্ছি মুডটির

> স্ত্রীরা সবসময়ই পুরুষদের দোষত্রুটির ছিদ্র একদম পিনপয়েন্ট করে নিয়ে গোলাবর্ষণে বিশ্বাসী। এর বিরুদ্ধে পুরুষদের কোনও প্রতিরোধই কার্যকরী নয়। বার্থ কেলেঙ্কারির সেই অমোঘ মুহূর্তে ট্রাভেল এজেন্ট মহাশয়কে যতবারই ফোন করি, তিনি নির্মল সারল্যে ফোন কেটে দেন। ফলে, আমার ভোকাট্টা হওয়ার পথটি একেবারে প্রশস্ত।

রিবার্থ ঘটল, আমাদের মধ্যে কয়েকটি বার্থের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও।

ফিরে আসা যাক আবার, নদীর শুকনো কোলের কলরবমুখরিত অন্ধকারে। শিয়ালদহ স্টেশনের সেই ভ্রুকুঞ্চিত মুখটি আবার ফিরে এসেছে। এবারের আক্রমণে সে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছে আরও দুই নারীকে। আমাদের গাড়ির তিন পুরুষের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার হচ্ছে এমন মহাকলরবে, যে চারপাশের ঝিঁঝিপোকারা আপাতত গণনীরবতার মাধ্যমে যেন কোনও গোপন শোক পালন করছে।

বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করলে কলম্বাস কেন আমেরিকা সন্ধানে সফল হত না, সে নিয়ে একটি ভাইরাল জোক আছে ফেসবুকে। আমাদের ডুয়ার্স বিশারদ বন্ধুটি, দেখতে না দেখতে তার বাস্তব সংস্করণ হয়ে গেল। দুঁদে সিবিআই ইনভেস্টিগেটরকে হার

মানানো অ্যাটিটিউড নিয়ে তার স্ত্রীসহ বাকি মহিলারা সমবেতভাবে তার দায়িত্ববোধ মাপছে...

—কী করে জানলে, এটাই নির্ভুল রাস্তা?

—লোকাল কোনও লোককে একবার পথ জিজ্ঞেস করলে কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হত কি?

—এই রিভারবেডে ডাকাতি হতে পারে, একবারও তুমি সেটা ভেবেছ?

—এবার এই অন্ধকারে পথ চিনে ফিরতে পারবে, তার কোনও গ্যারান্টি আছে?

পুরো একটা ঝড় বয়ে গেল। যার সারাক্ষণই অবশ্য বন্ধুটি বুদ্ধিমানের মতো, নিরুত্তর দার্শনিক হয়ে, আকাশের আবছা চাঁদ দেখে চলছিল। আর স্টিয়ারিং-এ মৃদু মৃদু তাল ঠুকছিল গাড়ির সাউন্ড সিস্টেম নির্গত একটি চাইনিজ গানের সুরে।

সেই অশান্ত প্রহরে অবশেষে প্রশ্নাতীত সিদ্ধান্ত একটাই। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলো পিচ রাস্তায়। সেখানে যদি স্থানীয় কোনও লোক ঠিকঠাক ডিরেকশন দিতে পারে, তবেই লঙ্কাপাড়া!

অতএব, ইউ টার্ন নিয়ে এবারে আগে আগে চলছে জাইলো গাড়ি, আর পিছনে পিছনে ম্রিয়মাণ মারুতি।

রণং দেহি প্রমীলাদের এক গাড়ি দূরত্বে রেখে এবারে ডুয়ার্স বিশারদ বন্ধু গলাখাঁকারি দিয়ে বেশ কনফিডেন্সের সঙ্গে বলল, দেখিস জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে, আবার এই একই রাস্তাতেই আমাদের ফিরতে হবে!

জজসাহেব নিরুত্তেজ স্বরে প্রথমে শুধু 'হুমম...' বলল।

পরমুহূর্তে গাড়ির চাকা বিরাট গাড্ডায় পড়তে, আমাদের সবারই মাথা ছুঁয়ে গেল সোজা গাড়ির ছাদে। সেই ধাক্কাটি সামলে নিয়ে সে তখন আরেকটু সংযোজন করল জবাবে, উফ! কী ভয়ংকর রাস্তা রে বাবা। আর তুই কিনা চাইছিলি, পথে একটু বৃষ্টি নামুক!

ইন্টারনেটমুক্ত থেকে ইন্টারনেটযুক্ত এলাকায় ফিরে প্রথমেই আমি গুগ্‌ল ম্যাপের শরণাপন্ন হয়েছিলাম ওই রাতের গোলমালটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পেতে চেয়ে। কারণ, ডিরেকশন-টিরেকশন জেনে আমরা শেষ অবধি দু'বার নদীর বেড পার হয়েই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছেছিলাম। রেঞ্জার সাহেব ফোনে যেমনটি বলেছিলেন।

কিন্তু ধাঁধাটা অন্য জায়গায়। মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া রোড দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে যাওয়ার পথে আমাদের সামনে একটাই নদী পড়েছিল, যেটায় গাড়ি নামিয়ে ঘোল খাওয়ার গোলমাল ঘটে। পরে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ফিরে যাওয়া হয় পিচ রাস্তায়। তারপর সে পথ ধরেই নদী ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে গিয়ে বাঁক নিতে হল উত্তর মুখে, যে পথে খানিকটা গিয়ে আবার বাঁক পূর্ব দিকে।

মানেটা বুঝলেন? ঠিক যেন একটা বর্গক্ষেত্রের তিনটি বাহু ধরে জার্নি, যার শেষ খেপে গাড়ির ডিরেকশন আবার সেই মাদারিহাটের দিকেই। অথচ এবারে কিন্তু পথে পড়ল দুটো নদী।

নদীর সংখ্যা পশ্চিম দিকে যেতে কেন একটি আর তার সমান্তরাল পুব দিকে যেতে দু'টি, সে রহস্য সমাধান করতে আমি গুগ্‌ল ম্যাপকে নিয়ে গেলাম স্যাটেলাইট মোডে। তারপর লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া আর টোটোপাড়া ধরে জুম করতে গিয়ে দেখি, ও হরি! দুই কোথায়? এ যে তিনখানা জলজ্যান্ত নদী! এই না হলে ডুয়ার্স!

ম্যাপ স্ক্রোল করে পুরো যাত্রাপথ রিট্রেস করে দেখতে গিয়ে তখন আমার একটাই আপশোস! ইস্, জলদাপাড়ায় দুপুরটা না কাটিয়ে সে দিন যদি দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা ওই রিভারবেডে পৌঁছে যেতাম, কী দারুণই না হত পথ আবিষ্কারের অভিজ্ঞতাটা! কারণ, ম্যাপ দেখাল, প্রথমে যে রিভারবেডে আমরা নেমেছিলাম, সেটা উত্তর মুখে অনেকটা গিয়ে দ্বিতীয় একটা নদীতে মিশেছে। এই দু'টি মিলেই আসলে আমাদের যাত্রাপথের প্রথম নদীপথ, যেটা ধরে আরও উত্তরে গেলে একসময় সে জায়গাটি আসবে, যেখানে নদীর দু'দিকে পিচ রাস্তা এসে থেমে গিয়েছে।

পূর্বকথিত বর্গক্ষেত্রের তৃতীয় বাহু ধরে এই পয়েন্টে এসেই আমরা প্রথম নদীটি পার হই। তারপর পিচ রাস্তা ধরে আবার পুব মুখে যাত্রা এবং দ্বিতীয় ভেবে যে নদীটি অতঃপর পার হওয়া, ম্যাপ অনুযায়ী আসলে তা নদী নম্বর তিন!

মোদ্দা কথা হল, ডুয়ার্স বিশারদ বন্ধুটি ঠিক পথেই সে রাতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। তবে ওই পথে সেটা তার প্রথমবার। সুতরাং রাতের অন্ধকারে নদীর বেড থেকে পিচ রাস্তায় ওঠার সঠিক জায়গাটা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষেও যথেষ্ট দুষ্কর ছিল। তাই, থিয়োরিটিক্যালি ঠিক দিকে এগলেও, নদী ধরে চলতে চলতে সে যাত্রায় ঠেকতাম হয়ত গিয়ে একদম ফুন্টশিলিঙে!

যা-ই হোক, ঘুরপথেই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছেছিলাম সে দিন। নিরাপদেই। তবে, বেশ গভীর রাতে।

লঙ্কাপাড়া পর্বে আরও হরেক কাণ্ড তখনও আমাদের জন্য অপেক্ষায়। তিন নদীর অচিন মানচিত্র পেরিয়ে অন্য আরও কিছু বিস্ময়। সে ডুয়ার্সের গল্প, না-হয় আরেকদিন...

অভিজিৎ সরকার

পর্যটনের ডুয়ার্স

মালবাজারের বালাজি মন্দির

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে তার নিজস্ব গতিতে। ভেজা ভেজা বাতাস, নীল আকাশ আর দু'পাশে সবুজে সবুজ... মাঝখান দিয়ে বহু দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে এক সরলরৈখিক পথ। গাড়ির ভিতরে বাজতে থাকা 'আমার সারাটা দিন মেঘলা আকাশ বৃষ্টি তোমাকে দিলাম' যেন আমাদেরই মনের কথা। আমরা ডুয়ার্সে চলেছি।

ডুয়ার্স মানেই এক অনাবিল সৌন্দর্যে গা ভাসিয়ে দেওয়া। চা-বাগান, মূর্তি, কালজানি, তোর্সার মতো অসংখ্য নদী, মেটেলি পাহাড়, বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল— গর্ব করার মতো উপকরণের খামতি নেই কোথাও। অসংখ্য ছোটবড় গ্রাম এখনও মাটির গন্ধে ম-ম করে। এরই মাঝে মাল নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছোট্ট বন-ঘেঁষা শহর মালবাজার। যাতায়াতের পথেই চোখ জুড়িয়ে যায়। শহরের মাঝেই বেশ পুরনো উদ্যান। ছুটির দিনগুলোতে সময় কাটানোর আদর্শ জায়গা। রকমারি ফুলের সম্ভারসমৃদ্ধ এই উদ্যান অর্কিডের জন্য বিখ্যাত। গড়ে উঠেছে ছোটবড় অনেক রিসর্ট। আছে সরকারি বাংলো। ডুয়ার্স বেড়াতে এলে মাল শহরে না থাকলে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ।

বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই শহরে নতুন সংযোজন 'বালাজি মন্দির', যা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের কারণেই। ক্যালটেক্স মোড় থেকে দু'পা এগিয়ে বাঁ দিকে ঘুরেই অহরহ ঘণ্টাধ্বনি জানিয়ে দেয়, সামনেই মন্দির। রাস্তায় শোনা গেল, মন্দিরটি নাকি প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের হাতে। কাছে যেতেই চোখ ধাঁধানো অপূর্ব কারুকাজের ইট-রঙের আগাগোড়া মোড়া মন্দিরটি বর্তমানে পর্যটকদের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। মার্বেল ছাড়াও গ্রানাইট ও গোলাপি পাথরে তৈরি মন্দিরটিতে ঢুকেই ডান দিকে বাঁধাই করা বড় শিবলিঙ্গ... শিব পুজো দিয়েই শুরু করা গেল মন্দির দর্শন। উলটো দিকে রয়েছে প্রসাদের দোকান। লাড্ডু, প্যাঁড়া, গঙ্গাজল, হনুমানজির সিঁদুর, মানত করার জন্য নারকেল— পাওয়া যাচ্ছে সবই। নিচের হলঘরটিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা ও ভোগঘর। প্রয়োজনে চা-ও মিলতে পারে।

নিচে সিঁড়ির মাথায় ঝোলানো ঘণ্টা মন্দিরের পরিবেশকে আরও আধ্যাত্মিক করে তুলেছে। দোতলায় ওঠার আগে চামড়ার বেল্ট, পার্স সব খুলে রেখে যেতে হয়। সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপে জমানো জলে পা ধুয়ে উঠে পড়লাম দোতলার মূল মন্দিরে। ঢুকতেই সামনে বিশাল বালাজির মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনই সুন্দর তাঁর রত্নখচিত সিংহাসন। বিরাট হলঘরটিও তা-ই। মাথার উপর পেল্লাই সাইজের একটা ঝাড়বাতি আর অপূর্ব সব কাজ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মাঝের বড় বালাজিমূর্তির দু'পাশ দিয়ে সারি সারি নানা দেবদেবী রোজ পূজিত হচ্ছেন এখানে। সূর্য দেবতা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, সরস্বতী দেবী, গণেশ, অঞ্জনা, হর-গৌরী, রাম-সীতার মূর্তি ঘিরে রয়েছে চারদিকে। রয়েছে রামশিলাও। বাজতে থাকা ভজন পরিবেশটাকে এক আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে নিঃসন্দেহে। মোজাইক করা মেঝেতে বসে যতক্ষণ খুশি দেবতা দর্শন বা আরাধনা করা যায়। আমরা পুজো দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলাম, এই ক্ষয়ে যাওয়া জীবনে এতটুকু পুণ্যলাভের চেষ্টা আর কী!

লাড্ডু, নারকেল দিয়ে পুজো সেরে এবার নিচে নামার পালা। বাবার কাছে মনের ইচ্ছে জানিয়ে লাল কাপড়ের টুকরোয় গিঁট বেঁধে রাখলাম। ইচ্ছেপূরণ হলে আরেকবার এসে গিঁট খুললেই নিশ্চিন্ত। তারপর আবার উপরে উঠে বাবার আশীর্বাদি টিকা লাগিয়ে চরণামৃত নিয়েই সে দিনের মতো পুজোর আচার শেষ। এর পর নিচে অন্নপ্রসাদ গ্রহণের পালা (অবশ্যই ইচ্ছে হলে)।

মঙ্গল, শনিবার বিশাল লাইন পড়ে। মূল মন্দিরের উলটো দিকেই খাওয়ার ব্যবস্থা। বসে, দাঁড়িয়ে খাওয়া যেতে পারে ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারি, পনির, লুচি, সুজি, পাঁপড়। একটাই শর্ত, এতটুকু প্রসাদ নষ্ট করা যাবে না। দিনের বেলার মতোই রাতের মন্দিরটিও কম আকর্ষণীয় নয়! আলো ঝলমল মন্দিরের ঔজ্জ্বল্য মনে গেঁথে থাকে চিরদিনের জন্য। স্বেচ্ছাসেবকরাও বেশ সহযোগিতাপূর্ণ। সব আচার শেষে যখন মন্দির থেকে বেরলাম, ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। এর পর ফেরার পালা। আবার আসব, কথা দিয়ে ফিরে চললাম ডুয়ার্সের অন্য এক ঠিকানায়। সে গল্প অন্য আর-একদিন।

কীভাবে যাবেন— এনজেপি-তে নেমে গাড়ি রিজার্ভ করে চলে যাওয়া যায় মালবাজারে। সরাসরি বাসও আছে।

কখন যাবেন— ডুয়ার্স সবসময়ই সুন্দর, তবে বর্ষাকালটা এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় হবে।

শাঁওলি দে

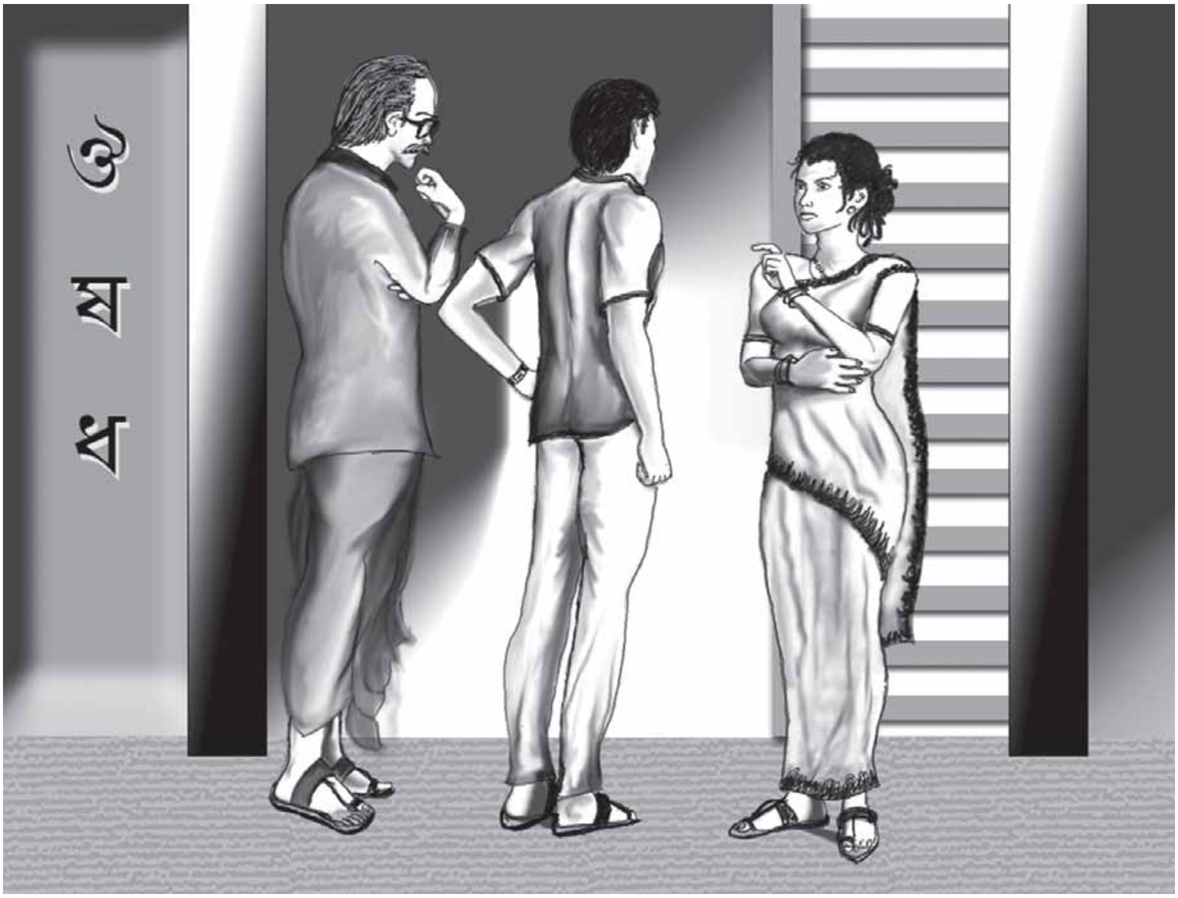

স্কেচ : দেবরাজ কর

ডুয়ার্সের পাত্রী চাই?

বিচিত্র মানুষের সচিত্র ডুয়ার্স

সাগরিকা রায়

ব্যান্ড পার্টি আসছিল। বর এসেছে। চৌমাথায় অপেক্ষা করবে। ব্যান্ড পার্টি-সহ কন্যাপক্ষ বরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবে। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কন্যাপক্ষ এখনও এসে পৌঁছায়নি বলে সবাই চিন্তিত ছিল। এখন ব্যান্ডের আওয়াজ শুনে সবাই নিশ্চিত। যাক, আসছে। সাদা ড্রেস, মাথায় জরিদার লাল টুপি। একটা নির্দিষ্ট সুর আছে বরকে অভ্যর্থনা করার। ফুলে সজ্জিত বরের গাড়িকে উদ্দেশ্য করে বাঁশি সুরের তালে তালে স্কেল চেঞ্জ করছে। মহিলারা চওড়া নেকলেস, চিকে কণ্ঠদেশ আবৃত করেছেন। কানে ঝুমকো বা পাশা। হাতে মানতাসা, বাউটি, বালা। পরনে বেনারসি, বলখোঁপায় প্লাস্টিকের বেল কুঁড়ি। ভিয়েন বসেছে বাড়িতে। মাটির খুরি, কলাপাতা ডাঁই করে রাখা একপাশে। বাড়ির সামনে অনাড়ম্বর ‘গেট’। তাতে ‘শুভবিবাহ’ লেখা। পাড়ার অভিজ্ঞ মানুষরা পরিবেশন করবেন। বাজি ধরে খাওয়া হত। এখনও সেসব গল্প শুনি। কারা যেন পঁয়ষট্টি টুকরো মাছ খেয়েছে। কোথায় ছিল ক্যাটারার, কোথায় ছিল সুদৃশ্য ভবনের ঠিকানা! সারারাত জেগে তরকারি কোটা, ঘন ঘন চা খাওয়া, ঘিনিমাসিমার পান-ঠাসা মুখের মজার গল্প বিয়েবাড়ি জমিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চাদের চ্যা-ভ্যা চলতেই থাকে। মায়েরা বিধ্বস্ত। এখন বিউটি পার্লারে গিয়ে সাজগোজ চলে। পাড়ার সেই দাদা-কাকারা কোথায় যে গেলেন! কেষ্টদার বউ খেতে বসে চেঁচিয়ে ডাকেন— বিপুল, মাছের মুড়োটা এইদিকে...! বিপুল মাছের বালতি নিয়ে ছুটে আসে— এই যে বউদি...! খেতে খেতে কান খাড়া— ‘শুভদৃষ্টিটা হয়ে গেল না তো?’ শুনে অন্যজনের উত্তর— ‘না রে, ব্যান্ড পার্টি তাহলে সেই সুর তুলত!’ সেরকম সুর মানে? শুভদৃষ্টির সঙ্গে তাল রেখে, মিল রেখে সুর তোলা ব্যান্ডের নিয়ম। যখন ব্যান্ড পার্টির চল ছিল না, তখন পাড়ার বউ-ঝি-রা মিলে এক জায়গায় বসে ‘সুখে থাকো সোনার বরন মেয়ে’ বা ‘আজ ভুলিয়া যেয়ো না আমারে, আমি তো তোমারই দাসী’ ইত্যাদি গাইত। ব্যান্ড পার্টির যুগ শুরু হলে সিনেমার গানের চল হল। ‘মালাবদল হবে এ রাতে’, সাত পাক ঘোরা মানেই ‘আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা’। কন্যা বিদায় পর্বে তো গানের দফারফা দশা— ‘ওরে মনপাখি, কেন ডাকাডাকি, তুই থাক না রে গোপনে’, ‘যা রে! যা রে উড়ে যা রে পাখি’। একবার শুনেছিলাম ‘হাথি মেরে সাথি’ ছবির ‘নফরত কি দুনিয়া ছোড়কে পেয়ার কি দুনিয়া মে খুশ রহো মেরে ইয়ার’। ডুয়ার্স গান

ভালবাসে। স্কুলে দিদিমণি-দাদামণি, মানে ম্যাডাম-স্যারেদের ফেয়ারওয়েল হবে, গান হবে না? 'বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, ভরা থাক'। কিন্তু একবার মর্মান্তিক গান গেয়ে চোখের জল শুকিয়ে দিয়েছিল বিউটি নামের ছাত্রী। কী সেই গান? বিদায় সংগীতের তীব্র মূর্ছনায় নবনীতা দিদিমণির ভয়সংকুল চেহারা আজও চোখে ভাসে— 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। হাসি হাসি পরব ফাঁসি...'। সেই কিশোরের মুখ ভেসে উঠল বিদায় প্রাঙ্গণে।

নাঃ, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁচকা টানে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে দেখি পাশের বাড়িতে বরকে বরণ করা হচ্ছে। ব্যান্ড পার্টি যথারীতি তাদের সুরে নেমে গিয়েছে— 'ঠাকুরজামাই এল বাড়িতে'।

ডুয়ার্সের বিবাহ রীতিতে গারোদের মধ্যে অদ্ভুত নিয়ম ছিল। পাত্রকে সারাদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। তাকে জোর খোঁজাখুঁজি চলবে। এদিকে পাত্রী অপেক্ষমাণ। যথারীতি পাত্র ধরা পড়ে ধরা দিতে। তাকে চ্যাংদোলা করে হাসি-মজাতে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাভাদের মধ্যে হোউসুক সোউরু বা জ্ঞাতি-গোত্রের ভিতরে বিবাহ চলে না। উপায়ান্তর না থাকলে কন্যাকে গোত্রান্তর করে তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়। ডুকপাদের আবার আচারসর্বস্ব বিবাহ রীতি নয়। ছেলেমেয়ে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করে। পুরনো ডুয়ার্সে অবশ্য নিয়ম মেনেই বিয়ে হত। পাত্রী দেখা থেকে শুরু করে দ্বিরাগমন-টমন এখনকার মতোই। জলপাইগুড়ি থেকে পাত্রপক্ষ যাচ্ছিল মাদারিহাটে। মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি। পাত্রর বাবার মাথা ধরেছিল। এখানে কি মেডিসিন শপ আছে? হ্যাঁ, ওই যে! একটা ট্যাবলেট আনতে নেমে পড়ল পাত্র স্বয়ং। দোকানে মালিক নেই। পরিবর্তে আঠারো বছরের এক তরুণী দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে। দাদা একটু বাইরে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেক দোকান পাহারা দিচ্ছে বোন। ওষুধ সে দিতে পারল। জল?

—ও বাবা! জলও দিতে হবে নাকি? তরুণীর খর জবাব।

—সে কী? জল দেওয়া পুণ্যের কাজ, অথচ আপনি এক গ্লাস জল দিতে হবে বলে... পাত্রর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। তর্কাতর্কি এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, পাত্রর বাবা মাথাব্যথা নিয়ে নেমে এলেন গাড়ি থেকে। এত দেরি হচ্ছে কেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে তরুণী মুহূর্তে বিবাদ থামিয়ে এক গ্লাস জল আর ট্যাবলেট এগিয়ে দিল— নিন, মাথা ধরেছে তো?

—কী করে বুঝলে মা?

—মুখ দেখে। কপাল ধরে আছেন যেভাবে...। আর এই ভদ্রলোক আপনার কথা ভুলে গিয়ে তর্ক জুড়েছেন। কী উচিত, কী অনুচিত, সেটা ইনি কী শেখাবেন বলুন?

তা তো ঠিকই। বৃদ্ধর মাথাব্যথা তখন অন্য বিষয়ে। মাদারিহাট যাওয়ার কী দরকার? এই মেয়ে তো মন্দ নয়! এখন জাত-গোত্রে মেলে কি না দেখা চাই।

এভাবেই বিয়ে হয়ে গেল। সারাদিনে একটা কি দুটো বাস এসে দাঁড়াত। কীভাবে পাত্র এসে পৌঁছেছিল ডুয়ার্সের একান্ত কোণটিতে পাত্রীর পাশে। সেসব দিন স্মৃতিকথা মাত্র। এটা একটা ঘটনা। সবসময় এত সহজ হত না। কতবার পাত্রী দেখা চলে। কতবার পাউডার মেখে বসতে হয়!

একজন পুরোহিতমশাইয়ের কথা শুনেছি। তিনি ছিলেন ভারী চটপটে। তাঁর এই চটপটে ভাব বিয়ে, পুজো— সবেই দেখা যেত। সরস্বতী পুজোর দিন তাঁর স্পিড আরও বেড়ে যেত। এক জায়গায় পুজো সেরে চলে যাচ্ছেন আরেক জায়গায় পুজো করতে। মনে হত যেন একটা ঘূর্ণি বায়ু বয়ে গেল। কতবার তাঁর নামাবলি খুলে পড়ে যেত পথে। পথচারীরা ডেকে সাইকেল থামিয়ে নামাবলি এনে দিত তাঁর হাতে। শ'খানেক পুজো হাতে। সাইকেলে বসেই— 'বলো, জয় জয় দেবী, চরাচরসারে... ' বলেই 'বাকিটা তরা কইয়া ফ্যালা' বলে উধাও। কেবল একটা ধুলো-ঝড় বয়ে গেল দূর রাস্তায়। পুরোহিতমশাইকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় আমার। লক্ষ্য একটা বিবাহ বর্ণনা। পুরোহিতমশাইয়ের একটি কন্যা ছিল। সুনন্দা। সাধারণ ঘরোয়া টাইপের মেয়ে। তো, তার বিয়ে ঠিক হল চব্বিশ পরগনার কোন এক গ্রামে। কিছু চেনা নয়। মেয়েটি ভয়ে ভয়ে আছে। যেমনটা হওয়া উচিত। বউভাতের দিন রাতে পাড়ার নিমন্ত্রিত মহিলাদের মাঝখানে বসেও সুনন্দা বিষণ্ণ। ঠিক সেভাবে কাঁকন বাজছে না। বরটি যেন একটু আড়ালে আড়ালে রয়েছে। শাশুড়ি এসে মাঝে মাঝে দেখে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে এক নিমন্ত্রিত মহিলা পাশের জনকে বলছিল, আগের বউ বেশি সুন্দরী ছিল।

সুনন্দার কান খাড়া। আগের বউ মানে?

—আর মানে খুঁজে হবে কী? সুনন্দা বউটির হাত চেপে ধরে— আগের বউ কোথায়?

বউটি ভয় পেয়ে গেল— তুমি জানো না? তাকে তো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শাশুড়ি আর তার ছেলে মিলে।

—কেন?

বউটি ফিসফিস করে, তোমার শাশুড়ি বড্ড কড়া গো। আগের বউকে খুব জ্বালিয়েছে।

সুনন্দা এক মুহূর্ত চিন্তা করে। আগের বউয়ের খবর এখনও বলেনি বরপক্ষ। এরা অন্যায় করেছে। পুরোহিতমশাইয়ের লোকবল কম। পাত্র সম্পর্কে খবর জোগাড় করে উঠতেও পারেননি। কিন্তু সুনন্দা কি ফিরে যাবে বাড়িতে? বাবা কষ্ট পাবেন ও ফিরে গেলে। যখন এরা তাড়িয়ে দেবে, তখন? বাবার কাছেই ফিরে যেতে হবে। কে বলতে পারে, এরা আরও বেশি কিছু করবে না সুনন্দার সঙ্গে?

শেষ রাতের ঠান্ডায় গ্রাম ঘুমে আবিষ্ট। সুনন্দা গয়নাগাটি যা ছিল, গুছিয়ে নিল। তারপরে খিড়কির দরজা খুলল। সারাদিনের ক্লান্তিতে বরবাবাজি ঘুমিয়েছে। সুনন্দা ছুটতে ছুটতে অনেকটা গিয়ে বুঝল রাস্তা

ডুয়ার্সের বিবাহ রীতিতে গারোদের মধ্যে অদ্ভুত নিয়ম ছিল। পাত্রকে সারাদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। তাকে জোর খোঁজাখুঁজি চলবে। এদিকে পাত্রী অপেক্ষমাণ। যথারীতি পাত্র ধরা পড়ে ধরা দিতে। তাকে চ্যাংদোলা করে হাসি-মজাতে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাভাদের মধ্যে হোউসুক সোউরু বা জ্ঞাতি-গোত্রের ভিতরে বিবাহ চলে না। উপায়ান্তর না থাকলে কন্যাকে গোত্রান্তর করে তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়।

হারিয়েছে। একটা লোক হাতে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। সুনন্দা ধরে বসল— দাদা, স্টেশন কোন দিকে? লোকটি ওদিকেই যাচ্ছে। সুবিধে হল। পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ সুনন্দা বাড়িতে এসে পৌঁছাল।

তার পরের ঘটনা পরিচিত। বহু বছর আগের ঘটনা। যেভাবে সুনন্দা ঘরে ফিরেছিল, সেটা সে সময় বলেই সম্ভব ছিল। আবার সুনন্দার মতো মেয়েরা ঝুঁকি নিতে জানে সব কালেই। শাল-শিরীষের বাতাস মেখে যে মেয়ে বড় হয়েছে, সে এত জোর সেই বাতাস থেকেই তো পেয়েছে।

সেরা সুকন্যা

কোচবিহার ছাত্র-যুব উৎসবে প্রথম হয়ে এবার রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবেও মূকাভিনয়ে প্রথম হল কোচবিহারের সুকন্যা দত্তগুপ্ত। কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি চলা রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে কোচবিহার থেকে ৯৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ১৯ জন প্রতিযোগী মূকাভিনয় করলেও কোচবিহারের সুকন্যা সবাইকে পিছনে ফেলে এই সম্মান ছিনিয়ে আনে। উপহারস্বরূপ পেয়েছে একটি সোনার মেডেল, শংসাপত্র এবং সাড়ে তিন হাজার টাকার একটি চেক। সেই ছোট্ট থেকে নাটকে হাতেখড়ি সুকন্যার। মূকাভিনয়ে গুরু হিসাবে পেয়েছে নিজের বাবা, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও মূকাভিনেতা

শংকর দত্তগুপ্তকে। আনন্দম কালচারাল সেন্টারে শৈশব থেকে নাটক করে, মূকাভিনয় করে সুকন্যা আজ যথেষ্ট পরিচিত নাম। 'লেডি ম্যাকবেথ'-এ নামভূমিকায় তার অভিনয় সকলের নজর কেড়েছে। গত বছরও মূকাভিনয়ে জেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সে। এবার রাজ্যে প্রথম হয়ে স্বভাবতই খুশি সুকন্যা। জানায়, 'এই সম্মান শুধু আমার নয়, আমার জেলার সম্মান।' আগামী সংখ্যার শ্রীমতী ডুয়ার্স এই সুকন্যাই।

নিজস্ব প্রতিনিধি

কোচবিহার-আসামের তাঁত বস্ত্রে ফ্যাশানের ছোঁয়া দিলেন দোলা

এবারের শ্রীমতীর কাজটা একটু অন্য রকমের। আমরা রোজকার সংবাদপত্রে নানান হতাশাব্যঞ্জক খবরাখবরে বড্ড মন খারাপ করে থাকি। কিন্তু সংবাদপত্রের শিরোনামে আসে না এমন অনেক ভাল কাজ করে চলেছেন অনেকেই, যাঁদের কথা জানলে আমাদের আনন্দ হবে বইকি। দোলা গুহ নিয়োগী। Womania নামে নিজের একটি বুটিক আছে তাঁর। এরকম বুটিক তো থাকে অনেকেরই। বিশেষত্ব সেখানে নয়। আসামের নর্থ ইস্টার্ন ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইনিং কাউন্সিলিং-এর সদস্য তিনি। সেই সংস্থার তরফ থেকে সম্প্রতি 'ল্যাকমে ফ্যাশন উইক'-এ অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলেন মুম্বইতে। সারা ভারত থেকে সেখানে নানান ফ্যাব্রিকের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের ডিজাইনার। দোলা গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে। সেখান থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এমনই, যা ভবিষ্যতে তাঁর কাজের উৎসাহ বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। দেখেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের তাঁতিভাইদের তৈরি সাধারণ লাল গামছাকে ব্যবহার করে দারুণ ডিজাইনের পোশাক বানিয়ে রীতিমতো মডেল হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক মহিলা, যিনি কখনওই একজন বাঙালি নন। অথচ আমরা গামছাকে পোশাকে ব্যবহারের কথা ভেবেই দেখিনি কখনও। এই ফ্যাশন উইকের উদ্দেশ্যটাই হল, বিভিন্ন প্রদেশের ঐতিহ্যময় পোশাক এবং সাজকে তুলে ধরা এবং প্রত্যেকে নিজের জায়গার জন্য এমন কিছু নতুন ভাবনা ভাবা, যাতে তাঁতিগোষ্ঠীকে তাঁদের শিল্পের মধ্যে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। দোলার বিশেষত্ব এখানেই। তাঁর এবং আসামের যে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে তিনি কাজ করেন, তাদের ভাবনা একত্রিত করে গড়ে উঠতে যাচ্ছে কোচবিহার এবং আসামের মেলবন্ধনের গল্প। ব্যাপারটা এরকম। কোচবিহার ও আসাম পূর্বে একটিই এলাকা থাকায় এমন অনেক কিছু আজও রয়ে গিয়েছে, যেগুলো পরিচয় বহন করে চলেছে বহু প্রাচীন শিল্পের। তাঁতিরা হারিয়ে যাচ্ছেন,

এরপর ২৮ পাতায়

পাঠকের দাবিতে আবার শুরু হল জনপ্রিয় কলম 'ডুয়ার্সের ডিশ'। এবার থেকে ডুয়ার্সের রাঁধুনিরা হাজির করবেন রন্ধনশৈলীর নানা এক্সপেরিমেন্ট। সূচনা করলেন **শ্রাবণী চক্রবর্তী**, যাঁর হাতের রান্নায় মমত্ব ও জাদু দুই-ই আছে।

দই-আলু ফ্রাই

উপকরণ

ছোট আলু, চারকোনা করে কাটা ক্যাপসিকাম, ছোট গোটা পেঁয়াজ, আধ ইঞ্চি করে কাটা পেঁয়াজপাতা, চারকোনা করে কাটা বাঁধাকপি, আধ ইঞ্চি করে কাটা পেঁয়াজকলি, অর্ধেক করে কাটা কাঁচালংকা, টক দই, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন ও চিনি আন্দাজমতো, অলিভ অয়েল বা রাইস অয়েল ২/৩ চা চামচ।

পদ্ধতি

এই সমস্ত সবজি শীতকালে খুব ভাল পাওয়া যায়, আর এই সময় এই সবুজ সবজিগুলি শরীর ও ত্বকের জন্য ভীষণ ভাল। তা ছাড়া খেতেও খুব ভাল লাগে মুখরোচক এই ভাজা পদটি। প্রথমে ছোট আলুগুলিকে নুন ও ভিনিগার দিয়ে সেদ্ধ করে, খোসা ছাড়িয়ে টক দই ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে ম্যারিনেট করে, ১০/১৫ মিনিট রেখে দিতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে, দুটো কাঁচালংকা ও গোলমরিচ গুঁড়ো ফোড়ন দিয়ে, প্রথমে আলুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে একটু ভাজা ভাজা করতে হবে, তারপর একে একে সব সবজি দিয়ে খুব ভাল করে নাড়াচাড়া করতে হবে। নুন ও চিনি দিয়ে হালকা আঁচে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে নিতে হবে। এই রান্নার সময় গ্যাসের আঁচ সম করতে হবে ও ঢেকে রান্না করা চলবে না। পরোটা বা লুচির সঙ্গে খুব ভাল লাগবে। আবার চাউমিনের সঙ্গেও খুব ভাল লাগে।

শ্রীমতী ডুয়ার্স ক্লাবে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে মিলিত হয়েছিলেন সদস্যারা— নিজস্ব চিত্র

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:12,000
Full Page, B/W: 8,000
Half Page, Colour: 7,500
Half Page, B/W: 5,000
Back Cover: 25,000
Front Inside Cover: 15,000
Back Inside Cover: 15,000
Double Spread: 20,000

Special Rates for Local Trade only
Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page Bleed {19.5cm (W) X 27 cm (H)}, Non Bleed {16.5cm (W) X 23 cm (H)}, Half Page Horizontal {16.5cm (W) X 11.2 cm (H)}, Vertical {8 cm (W) X 23 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5cm (W) X 23 cm (H)}, Horizontal 16.5 cm (W) X 7.5 cm (H), 1/4 Page 8 cm (W) X 11 cm (H), 1/6 Page {5cm (W) X 11.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2016 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩
উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

২৬ পাতার পর

> কোচবিহার ও আসাম পূর্বে একটিই এলাকা থাকায় এমন অনেক কিছু আজও রয়ে গিয়েছে, যেগুলো পরিচয় বহন করে চলেছে বহু প্রাচীন শিল্পের। তাঁতিরা হারিয়ে যাচ্ছেন, দারিদ্রের কারণে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাঁদের পারিবারিক শিল্প থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলার ঐতিহ্যময় সুতোয় বোনা কাপড়ের উপর ছেদ পড়তে চলেছে খুব অল্প দিনের মধ্যেই।

দারিদ্রের কারণে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাঁদের পারিবারিক শিল্প থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। ফলে বাংলার ঐতিহ্যময় সুতোয় বোনা কাপড়ের উপর ছেদ পড়তে চলেছে খুব অল্প দিনের মধ্যেই। এই শিল্পকেই ফিরিয়ে আনা যায় কি না, তার প্রচেষ্টাই এই কাজের মূল উদ্দেশ্য। দোলা করতে চলেছেন কোচবিহার রাজার মোটিফকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ডিজাইন। যেমন, কোনও পোশাক এমন হতেই পারে, যেখানে রইল কোচবিহার রাজার আমলের মুদ্রা, কোনওটিতে হয়ত বা তাঁদের ব্যবহৃত গয়না, কোনওটিতে বা গড়ে উঠতে পরে রাজার সময়কার স্থাপত্যের নিদর্শন। এতে তাঁতিরাও নতুন করে উৎসাহ পাবেন তাঁদের শিল্পকে জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে দেখতে। তাঁরা এখন যেমন শুধু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন সামান্য টাকার বিনিময়ে, তখন তাঁরাও শিল্পী হিসেবে মর্যাদা পাবেন। এতে যদি সরকারি আনুকূল্য পাওয়া যায় তাহলে এই ভাবনা পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, এবং ভবিষ্যতে এইসব ডিজাইনারের সাহচর্যে আমাদের রাজ্য তথা উত্তরবঙ্গ উদাহরণ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বিশ্বের দরবারে। কোচবিহারকে নিয়ে দোলার কাজ অল্প দিনের মধ্যেই শুরু হবে। সে কারণেই প্রথমে যথেষ্ট পড়াশোনার দরকার, তা-ও শুরু করেছেন তিনি। সুতো হবে এখানকার কিংবা আসামের সিল্ক, আর ডিজাইন হবে কোচবিহার রাজার মোটিফ। কাজটি নিয়ে অনেক বড় ভাবনা ভাবছেন দোলা। কিন্তু আরও সঙ্গীসাথি দরকার। অনেকে মিলে করলে অনেক সুন্দর করে এগনো যাবে, এমনটাই ভাবছেন তিনি। তাই এই বিষয়টিকে সকলের সামনে তুলে ধরার কাজও শুরু করেছেন ইতিমধ্যে। বাংলার তাঁতশিল্পকে নিয়েও যে এত সুন্দর ভাবনা ভাবা হচ্ছে— এটাই আশাব্যঞ্জক। দোলার কাজ সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলুক— এই শুভকামনা রইল 'এখন ডুয়ার্স'-এর তরফ থেকে।

শ্বেতা সরখেল

বই পত্রের ডুয়ার্স

চিঠিতে পর্যটন ও অন্যান্য

বেড়াতে সবাই ভালবাসে। তবে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর কাছে বেড়াতে যাওয়া হল নেশা। গৌরীবাবু ফুরসত পেলেই বেরিয়ে পড়েন। পাশাপাশি, তিনি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা চমৎকার ভাষায় লিখে থাকেন বলে ভ্রমণ কাহিনি রচয়িতা হিসেবে তাঁর খ্যাতিও যথেষ্ট। খ্যাত-অখ্যাত বৃহৎ-লিটল— সব ধরনের পত্রিকাতেই তিনি অকাতরে বেড়ানোর গল্প লিখে থাকেন। অধুনা বয়সজনিত কারণে কিঞ্চিৎ কম লিখছেন বটে, কিন্তু ঘুরে বেড়াবার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোনওরকম শৈথিল্য লক্ষ করা যাচ্ছে না। ডুয়ার্সের কোণে কোণে তিনি আক্ষরিক অর্থেই ঘুরেছেন। থাকা-খাওয়া নিয়ে টেনশন তাঁর ধাতে নেই। বস্তুত, আপনি গিয়েছেন কিন্তু গৌরীবাবু যাননি, এমন কোনও স্থান ডুয়ার্সে নেই। নর্থ-ইস্ট-এর রাজ্যগুলিতে ঘুরে বেড়ানো নিয়ে 'নর্থ ইস্ট নট আউট'সহ একাধিক গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। এ বিষয়ে তাঁর গুরু হলেন জগন্নাথ বিশ্বাস।

ভ্রমণ কাহিনি লেখার সুবাদে লেখক ও সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে উঠেছে। এঁরা নিয়মিত-অনিয়মিত চিঠি লিখতেন। প্রাক্-মোবাইল যুগে লেখা সেসব চিঠির একটি গুচ্ছ সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন গৌরীবাবু। নাম 'চিঠির ঝাঁপি'। রাম শ্যামকে চিঠিতে কী লিখেছে— এটা জানার আগ্রহ চিরকালীন। তাই এই ধরনের বই পেলেই পড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তবে পড়ার আগে মনে হয়েছিল যে, গৌরীবাবু নিপাট আড্ডাবাজ পর্যটক। সুতরাং গুপ্ত সংবাদ মেলার আশা কম। প্রকাশিত চিঠিগুলিতে বিস্ফোরক ব্যাপার প্রায় নেই। গাঙ্গুটিয়া বাগানের একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের দু'-একটি চিঠি থেকে উত্তেজক কিছু মন্তব্য ছাড়া অধিকাংশই লেখালেখি সংক্রান্ত। প্রেরকরা সবাই গৌরীবাবুর লেখার ভক্ত। বেশি যাঁদের চিঠি ছাপা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় আর সনৎ চট্টোপাধ্যায় আছেন। তুষারবাবু অতি শক্তিমান কবি, কিন্তু চিঠিগুলিতে তিনি 'মানুষ' তুষার। তিনি গৌরীবাবুকে প্রথম দিকে সম্বোধন করেছেন 'মান্যবরেষু' বলে। সেটা এসে ঠেকেছিল 'ভাই গৌরী'তে। কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে, একবার তাঁকে 'গৌরীশঙ্করদা'ও ডেকেছিলেন। ২০০৪ সালের ৩০ জুলাই লেখা চিঠিতে তুষারবাবু লিখেছেন, 'হাসপাতাল-নার্সিং হোম, ওষুধে আমি শুধু ভারাক্রান্ত নই, বেশ বিপর্যস্ত। মনের জোরটা (প্রতিটি চিকিৎসকের অভিমত) বেশ প্রবল।' সে বছরই নভেম্বরের একদিন লিখলেন, 'চিঠি পেয়েছি। ভাল লাগল, কিন্তু ধাঁধার মতো মনে হল। বিড়ির মাত্রাটা বেড়ে গিয়েছে।'

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে মানুষকে বোঝা যায় ভালভাবে। গাঙ্গুটিয়া চা-বাগানের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় চাকরিসূত্রে বসবাস করেও সনৎ চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে 'উন্মেষ' প্রকাশ করেছেন। সে বাগানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। কিন্তু সনৎবাবু ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন, 'পৃথিবীর বীভৎসতম চাকরি বর্তমানে চা-বাগানের চাকরি। কবিতা-সাহিত্য-গাণ্ড— সব এখানে অসম্ভব!' এখানে 'বর্তমান' শব্দটি ভাবার মতো। এই চিঠি ১৯৯৮-তে লেখা। অথচ দু'বছর আগেই লিখেছিলেন গাঙ্গুটিয়াকে গভীরভাবে ভালবাসার কথা। সংকলনে সব চাইতে বেশি চিঠি সনৎবাবুরই লেখা। পড়ার পর বিচিত্র অনুভূতি হতে বাধ্য। লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের পড়া উচিত।

জগন্নাথ বিশ্বাসের চিঠিগুলি কাজের কথাই জানাচ্ছে। একটি চিঠিতে তিনি প্রাপককে অনুরোধ করেছেন গ্রিটিংস কার্ড ব্যবহার না করতে। এতে গাছ বেশি নষ্ট হয়। তাঁর লেখা চিঠি আছে বেশ কয়েকটি। এ ছাড়াও একটি-দু'টি করে চিঠি আছে অনেক গুণমুগ্ধের। এঁরা কেউ সম্পাদক, কেউ ভ্রমণপ্রেমী, কেউ পাঠক। তবে, যাঁদের অনেকগুলি চিঠি ছাপা হয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে চিঠির তারিখের ধারাবাহিকতা বজায় থাকা দরকার ছিল।

চিঠিগুলি থেকে প্রাপক সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া গেল। মাঝে মাঝেই তিনি কোথাও উধাও হয়ে যেতেন, চিঠির জবাব দিতেন না, আসব বলে আসতেন না। অনুমান করি যে, ভ্রমণের নেশায় তিনি মাঝে মাঝেই কথা রাখতে পারতেন না। একজন ভক্ত পাঠক গৌরীবাবুকে স্যান্ডার্স সাহেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অবশ্য এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই যে, লেখার মাধ্যমে ডুয়ার্সকে ভ্রমণরসিকদের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে গৌরীবাবুর অবদান অসাধারণ।

অশোককুমার মিত্র জলপাইগুড়ি থেকে নিবিষ্ট মনে ছোটদের জন্য লিখে আসছেন অনেকদিন ধরে। সাপ নিয়ে তাঁর 'সর্পকথা' বইটি ছোটদের কথা ভেবেই লেখা। সহজ ভাষায় সাপ চেনার উপায়, বিষক্রিয়ার লক্ষণ, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ইত্যাদি পেশ করেছেন, যা উৎসাহী সব বয়সের সাধারণ পাঠকের ভাল লাগবে। বড় আকারের ভাল কাগজে ছাপা বইটিতে অনেক ছবি আছে। সাপ নিয়ে হরেক তথ্যও পাওয়া যাবে। সাপ বিষয়ে ছোট থেকে সচেতন হওয়ার জন্য এই ধরনের বই দরকারি। তবে, রঙিন হলে আরও আকর্ষণীয় হত।

অশোকবাবুর দ্বিতীয় বইটি ছড়ার বই। নাম 'দোলনচাঁপা'। ছোটদের জন্য তাঁর ছড়ার হাতটি মন্দ নয়। ৩২ পাতার বইটিতে ছোটদের উপযোগী ভাবনা নিয়ে হরেকরকম ছড়া আর ছবি পাওয়া গেল। রাজকন্যার বিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চরত্ন, কলকাতা শহরে, চলো যাই পাহাড়ে প্রভৃতি ছড়ার নাম থেকে বিষয়বৈচিত্র বোঝা যায়। 'দোলনচাঁপা' ছড়াটি বেশ সুন্দর। ভাল লাগে 'ভোরের সবুজ ঘাসে রাতের শিশির/ চারিধার হিমসাদা কুয়াশা নিশির'-এর মতো লাইন। তবে ২৬ আর ২৭ পাতায় প্রায় একই ছড়া ছাপা হয়েছে। প্রতি পাতায় একটু মোটা তুলিতে সুন্দর ছবি এঁকেছেন পার্থ মৈত্র।

বেশ ছোটদের জন্যই বইটি লিখেছেন অশোকবাবু। তারা এইসব ছড়া পড়তে অপছন্দ করবে না। অশোকবাবুর ছড়া-কবিতা-রচনায় এক ধরনের সারল্য আছে, সেটা মানতেই হবে।

চিঠির ঝাঁপি। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠি। ঝর্না ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত। শিলিগুড়ি। ৩০ টাকা। **সর্পকথা**। অশোককুমার মিত্র। **সোনার তরী**। কলকাতা-৯। **দোলনচাঁপা**। অশোককুমার মিত্র। ছোটদের কচিপাতা। কলকাতা-৯। প্রতিটি ৫০ টাকা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

আলোচনার জন্য বই-পত্রপত্রিকার কপি জলপাইগুড়ির ঠিকানায় পাঠান। 'এখন ডুয়ার্সে আলোচনার জন্য' লিখে দিতে হবে।

রূপসী ডুয়ার্স

খুশকি থেকে মুক্তি

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান **মালা দাস**

চুল মানুষের সৌন্দর্যের চাবিকাঠি— এখন এর সমস্যাতে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়েন। বর্তমান যুগে সকলেই এই সমস্যায় ভুগছেন ছোট-বড় সকলের মুখেই এক কথা— চুল পড়ে যাচ্ছে। এটি নানা কারণে হয়— আমি একটা কারণ নিয়ে আলোচনা করছি, 'খুশকি'। খুশকি আসলে স্ক্যালপের এক ধরনের ডিজঅর্ডার। এর অনেক রকম ধরন হয়। তবে সাধারণভাবে শুষ্ক ও তৈলাক্ত দেখা যায়। শুষ্ক হলে চুলের উপর ভেসে থাকে এবং দেখা যায় কিন্তু তৈলাক্ত হলে স্ক্যাল্পে লেগে থাকে। তৈলাক্ত হলে যার সমস্যা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না তার চুল পড়ার কারণ কী? খুশকি থেকে ভুরু পরে যায় এবং ত্বকে নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়। তাই এটাকে অবহেলা করা যাবে না। রোজ তার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন, স্ক্যালপকে পরিষ্কার রাখতে হবে।

খুশকির জন্য বিশেষ ধরনের শ্যাম্পু পাওয়া যায়। রুক্ষ চুল ও খুশকির সমস্যায় সপ্তাহে একদিন হট অলিভ অয়েল স্ক্যাল্পে ম্যাসাজ করে হট টারবান থেরাপি করুন। পরদিন শ্যাম্পু করুন। এছাড়া রিঠা, আমলকি ও

শিকাকাই সারা রাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন সেই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে পরিষ্কার করুন। খুব ভালভাবে ধুতে হবে। স্ক্যাল্প ও চুল সবসময় খুব ভালকরে ধুয়ে ফেলুন। স্ক্যাল্পকে যত পরিষ্কার রাখবেন তত ভাল। তৈলাক্ত বা রুক্ষ স্ক্যাল্পে ভিনিগার লাগাতে পারেন শ্যাম্পু করার আধ ঘণ্টা আগে। ২ চামচ ভিনিগার লাগাবেন। তারপর ভাল করে ধুতে ভুলবেন না। তৈলাক্ত স্ক্যাল্পে কখনও তেল লাগাবেন না। তৈলাক্ত স্ক্যাল্পে ডিমের সাদা অংশ ও লেবুর রস ৪/৫ ফোঁটা ভাল করে মিশিয়ে চুলের গোড়াতে লাগান। ২০/২৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন। স্ক্যাল্প ব্যবহার করুন। হেনা করতে পারেন ৩/৪ চামচ লেবুর রস, ডিম, টক দই ও হেনা মিশিয়ে আধ ঘণ্টা লাগিয়ে রাখুন। তারপর ধুয়ে ফেলুন। ১৫ দিনে একবার করতে পারেন।

বর্তমান যুগে নানা পদ্ধতিতে আপনি আপনার খুশকি দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। পার্লারও আপনাকে সাহায্য করে থাকে। যেমন Ozone, Hair Spa, Ener Spa ইত্যাদি। চুলে যত্নের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকেরও যত্ন করুন। খাবার প্রতিও নজর রাখুন। যোগাসন করুন। বজ্রাসনে বসে চুল আঁচরান। খাবার পর বজ্রাসন করুন। হজম যত ভাল হবে তত চুলের স্বাস্থ ভাল থাকবে। জল দিনে ৭/৮ গ্লাস খাবেন। মনকে ভাল রাখুন, এটাও একটা সবকিছুর চাবিকাঠি— ভাল থাকার।

নিজের রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান sahac43@gmail.com এই ইমেলে

AANGONAA
Ladies Beauty Clinic
Shahnaz Herbal • Aroma Therapy
Lotus Professional • Lotus Ultimo
Cheryl's Cosmeceuticals (Hair & Skin)
Loreal Professional
Schwarzkopf Professional
7 Bagha Jatin Road, Siliguri 734001
Satyajit Sarani, Shivmandir
Call : 9434176725, 9434034333

অরণ্য মিত্র

।।৭৬।।

বুদ্ধ ব্যানার্জি তবে নেমে পড়লেন ‘ব্ল্যাক বেঙ্গল’-এর হয়ে? কনক দত্ত যে ঠিক পথেই যাচ্ছিলেন, এবার সেটা বোঝা গেল। কিন্তু ফালাকাটার যুব নেতা নবেন্দু মল্লিকের জন্য অপেক্ষা করেছিল বিচিত্র এক বিস্ময়। তাঁর বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে ‘কন্যাসাথি’। শুক্লা দাস আবার অপ্রতিরোধ্য! বুদ্ধ ব্যানার্জিই তার নিয়তি তবে? ক্যাভেন্ডিস অবশ্য ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে, বুদ্ধ ব্যানার্জি কিছু ভুলে গিয়েছেন। কারণ, দিল্লি হাই-এর তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে তাঁর সামনে আসছে অদ্ভুত সব তথ্য। ভবিষ্যতের ডুয়ার্সে জন্ম নিচ্ছে এক সুকৌশলী অপরাধচক্র? পড়তে থাকুন এই ভিন্নধর্মী, বিতর্কিত মেগাসিরিয়াল।

কনক দত্ত নিশ্চিত যে, শ্যামলকে কাশিয়াগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে কাজ দেওয়ার নাম করে নিয়ে যাওয়ার কাজে জগন্নাথ জড়িত। জগন্নাথ দিনে বেশ কয়েকবার যাকে ফোন করে, তার অবস্থান কাশিয়াগুড়িতেই। কিন্তু সিম কার্ডের সূত্রে যে নাম পাওয়া গিয়েছে, সে নামে কাশিয়াগুড়ি এলাকায় কেউ থাকে না। তবে কনক দত্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে অনুমান করেছেন যে, সিম কার্ড অন্যের। কন্যাসাথি এনজিও এবং শ্যামল নিখোঁজ রহস্যের মধ্যে একটা যোগাযোগ কোথাও থাকতেই হবে বলে কনক দত্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। নিখোঁজ হওয়ার দিন ভোরবেলায় শ্যামল ফোন করেছিল কন্যাসাথির হেড দিদিমণিকে। ওই অফিসে কেউ এমন আসেন, যিনি বেশ দামি সিগারেট পান করে থাকেন। শুক্লা দাস ড্রাইভারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এইসব এনজিও-র ড্রাইভাররা কত বেতন পায় যে বারো টাকার সিগারেট ফুঁকবে?

জলপাইগুড়ি থেকে পাওয়া শেষ খবর অনুযায়ী, কাশিয়াগুড়ির রহস্যময় ব্যক্তিকে বেশ কয়েকদিন কোনও ফোন করেনি জগন্নাথ। কাশিয়াগুড়ির ফোনটি টানা একটা লোকেশনে স্থির হয়ে আছে। সেটা হাই স্কুলের পশ্চিম দিকে একটা গাছপালায় ঘেরা বাড়ি। সে বাড়ির উপর নজর রাখার জন্য তিনি শ্যামলের মাকে বলে দিয়েছেন। সেটা কাশিয়াগুড়ির অন্যতম বিত্তশালী পরান দেবনাথের বাড়ি। সে বাড়ির একটা ছেলে মাঝে মাঝে কাজের জন্য বাইরে যায়। ইদানীং সে কাশিয়াগুড়িতেই আছে। বিকেলের পর বাজারের দিকে গেলেই তাকে পাওয়া যাবে লটারির দোকানের লাগোয়া মিষ্টির দোকানে।

শ্যামলের মায়ের পক্ষে সেই ছেলেটির উপর টানা নজরদারি চালানো সম্ভব নয় জেনে কনক দত্ত ঠিক করেছেন একটা চর লাগাবেন। ধূপগুড়িতে টহল দিয়ে বেড়ানো পুলিশের চরগুলোর একজনের খোঁজ তাঁকে দিয়েছেন পরি ঘোষাল। লোকটিকে এবার কাজে লাগিয়ে দিতে হবে।

শীত প্রায় চলেই গিয়েছে। বাইরে চৈত্রের দুপুর। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় উঠছে। বসার ঘরের জানলাগুলোর একটার পাল্লা হাওয়ার ধাক্কায় দুমদাম শব্দে বন্ধ হচ্ছিল বলে কনক দত্ত সেটার ব্যবস্থা করার জন্য জানলার সামনে এলেন। টেবিলের উপরে থাকা ফোনটা তখনই বাজল। হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে কনক দত্ত একটু অবাক হয়ে দেখলেন যে, পরদায় ফুটে উঠেছে— ‘আননোন নাম্বার’। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করার পর ফোনটা রিসিভ করলেন তিনি।

‘কেমন আছ কনক?’ একটা নরম গলা পেলেন কনক দত্ত। শোনামাত্র স্নায়ু টানটান হয়ে গেল তাঁর। খুব ভুল না হলে এই গলা তিনি কয়েকবার শুনেছেন চাকরিজীবনে।

‘চিনতে পারছ কি?’ ওপাশ থেকে কথা ভেসে এল, ‘একটু আগে বিশেষ একটা

স্যাটেলাইট ফোন পেয়েছি। ফোনে কথা বলাটা আবার শুরু করতে পারলাম। বেশ সুবিধের ফোন, বুঝলে কনক? নো রেকর্ড! কাশিয়াগুড়ির কেসটা নিয়ে আরও এগবে কনক?’

কনক দত্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্যামল নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কোনও বড় খেলুড়ের হাত থাকার কথা তিনি বারবার ভেবেছেন। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জি নিজে ফোন করে এ বিষয়ে খোঁজ নেবেন— এটা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

‘তোমার চেষ্টার প্রশংসা করি। তুমি তো শ্যামলকে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তা-ই না?’

‘আপনি সবই জানেন স্যার।’ কনক দত্ত নিজেকে সংযত রাখলেন।

‘শ্যামল বেঁচে নেই।’

‘আমিও তা-ই ধরে নিয়েছি। কে মেরেছে শ্যামলকে?’

‘বাচ্চাদের মতো প্রশ্ন করছ কনক!’ বুদ্ধ ব্যানার্জি হাসলেন, ‘তুমি তো ভালই এগিয়ে যাচ্ছ কেসটা নিয়ে! সময় হলে জেনে যাবে।’

‘কন্যাসাথি এনজিও-র সঙ্গে শ্যামলের কেসটার রিলেশন কী?’ কনক দত্ত এবার নিজেকে সামলে নিয়ে ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনিই বা আমাকে ফোন করছেন কেন এ নিয়ে?’

‘তুমি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছ!’ বুদ্ধ ব্যানার্জি কৌতুকের গলায় বললেন, ‘আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে সরিয়ে দেব কনক! বাট আই চেঞ্জড মাই প্ল্যান। বুঝতে পারলে কিছু?’

‘আপনি সব পারেন।’

‘আমি নতুন দল খুলছি কনক। নাম দিয়েছি ব্ল্যাক বেঙ্গল। ভাল না?’

‘স্যার, আইনের হাত কিন্তু খুব বড়।’ কনক দত্ত ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘আপনার কথা আমার ভাল লাগছে না। ফোনটা রাখতে পারি?’

‘আমার দলে যোগ দেবে কনক?’

কনক দত্ত কোনও জবাব দিলেন না।

‘ভেবে দেখো প্রস্তাবটা। শ্যামলের ফ্যামিলির জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেব।’ কথা শেষ করে ফোন কেটে দিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি।

৭৭

দলের বিচক্ষণ নেতার পরামর্শ মাথায় নিয়ে কয়েকদিন বেশ ছটফট করলেন নবেন্দু মল্লিক। নিজের পলিটিক্যাল কেরিয়ার ভোগে চলে যাক, সেটা তিনি চাইছেন না। কিন্তু বুদ্ধ ব্যানার্জির আশীর্বাদ উপেক্ষা করাও কঠিন। ছোট, বড়, মেজ মিলিয়ে রাজ্যে নেতার সংখ্যা নেহাত কম নয়! এদের মধ্যে কতজন বুদ্ধ ব্যানার্জির নেকনজরে পড়েছে? তাঁর

‘মিথ্যা বলব না। এস.টি. মেয়েদের পাচার করি আমরা।’ শুক্লা দাস প্রায় ঝুঁকে পড়ে নবেন্দু মল্লিকের উপর। তার বুক এসে স্পর্শ করে নবেন্দুর গাল। ‘তবে সোম-মঙ্গলের আগে রেড হবে না। আমরা শনিবার চলে যাব।’ ফিসফিস করে বলতে লাগল সে, ‘আপনি চাইলে আমি ফালাকাটায় চলে আসব। তেল মেখে, বড়ি আর দুধ খেয়ে আপনি খেলবেন আমার সঙ্গে।’

কৃপাদৃষ্টির আওতায় আসতে পারে কতজন? আর পলিটিক্সের কথাই যদি ধরা যায়, তবে নবেন্দু মল্লিক কি এমএলএ হওয়ার সুযোগ পাবে কোনও দিন? খুব বেশি হলে ভবিষ্যতে জেলা প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। তাই পলিটিক্যাল কেরিয়ারের কথা ভেবে বুদ্ধ ব্যানার্জিকে এড়িয়ে চলাটাকেও বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবতে পারছেন না নবেন্দু মল্লিক।

সকাল সকাল বেশ কিছু নগদ আমদানি হয়েছে। কোথায় জানি কে কী বানাচ্ছে। জায়গাটা নবেন্দু মল্লিকের ব্লকে তো নয়, তাঁর জেলাতেও নয়। তবুও দশ হাজার টাকা সক্কাল সক্কাল দিয়ে গিয়েছে কন্ট্রাক্টরের লোক। বুদ্ধ ব্যানার্জির সঙ্গে কাজ করার এটাই মজা। টাকাটা হাতে আসার পর শুক্লা দাসের কথাই মনে হচ্ছে কেবল। বিচক্ষণ নেতার অ্যাডভাইস মাথায় ঢোকার পর খুব চাপ যাচ্ছে। সেটা হালকা করার জন্য শুক্লা দাসের সঙ্গে একটু মাখামাখি করার চাইতে ভাল আর কিছুই হতে পারে না। ধূপগুড়ির রিটায়ার্ড পুলিশকে গরম দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও কথা বলতে হবে। সেখানে শুক্লা দাসের কোনও ধান্দা আছে কি না, সেটা দেখতে হবে।

শুক্লা দাসকে ফোন করে নবেন্দু মল্লিক জেনে নিলেন যে, দুটোর পর কন্যাসাথির অফিস ফাঁকা হয়ে যাবে। এটা জানার পরই তাঁর মনে পড়ল উত্থান তেলের কথা। স্টকে এখনও রয়ে গিয়েছে সেসব। খুব ভাল হয় যদি শুক্লা দাসকে তুলে নিয়ে কোনও রিসর্টে চলে যাওয়া যায়। ক’দিন আগে ‘হাই ভোল্টেজ মাসাজ’ নামে একটা পর্ন ভিডিয়ো পেয়েছিলেন নবেন্দু মল্লিক। সেটা তাঁর বেশ মনে ধরেছিল। শুক্লা দাসকে ভিডিয়োটা দেখিয়ে সেইরকম মালিশকর্মে তাকে নিযুক্ত করতে চাইছেন নবেন্দু। রিসর্ট না পেলে সেটা হবে কীভাবে?

ভারী মোটরবাইকে ডিগডিগ শব্দ তুলে কন্যাসাথির অফিসের সামনে দুপুর দুটো কুড়ি মিনিটে থামলেন নবেন্দু মল্লিক। এখন গরম পড়ে গিয়েছে। শুক্লা দাসকে বাইরে বসে থাকতে দেখলেন না তিনি। বারান্দায় উঠে বুঝতে পারলেন, সে আজ বসেছে দিদিমণির ঘরে। নবেন্দু ঘরে ঢুকে শুক্লা দাসের মুখোমুখি একটা টেবিলে বসে বললেন, ‘বাইরে গেলে হত না আজকে?’

‘অসুবিধা নাই।’ সবুজ শাড়ি-ব্লাউজ পরা শুক্লা দাস সুন্দর হাসল। তাকে বেশ লোভনীয় দেখাচ্ছিল সেই সময়। ‘তবে আমি আজ না হইলেও কাল আপনাকে ফোন করতাম। জরুরি কথা আসে।’

‘বলো।’ নবেন্দু মল্লিক আয়েশ করে একটা সিগারেট ধরালেন।

‘আজ বুধবার। সামনের সোমবার না হইলেও মঙ্গলবার পুলিশ কন্যাসাথির অফিস রেড করতে আসবে।’

‘মানে?’ ভুরু কুঁচকে গেল নবেন্দু মল্লিকের— ‘রেড করতে আসবে কেন?’

‘সেটা পরের কথা।’ শুক্লা দাস উঠে দাঁড়ায়— ‘আমরা শনিবার রাতে এখান থেকে সবকিছু নিয়ে চলে যাব। চলে যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে হেল্প করতে হবে। পুলিশ যাতে টের না পায়, সেটা আপনাকে দেখতে হবে।’

‘অসম্ভব!’ নবেন্দু মল্লিক জোরের সঙ্গে বললেন এবার, ‘পুলিশ এখানে রেড করবে কেন? কী করেছ তোমরা?’

‘মিথ্যা বলব না। এস.টি. মেয়েদের পাচার করি আমরা।’ শুক্লা দাস প্রায় ঝুঁকে পড়ে নবেন্দু মল্লিকের উপর। তার বুক এসে স্পর্শ করে নবেন্দুর গাল। ‘তবে সোম-মঙ্গলের আগে রেড হবে না। আমরা শনিবার চলে যাব।’ ফিসফিস করে বলতে লাগল সে, ‘আপনি চাইলে আমি ফালাকাটায় চলে আসব। তেল মেখে, বড়ি আর দুধ খেয়ে আপনি খেলবেন আমার সঙ্গে।’

কিন্তু নবেন্দু মল্লিক এবার ঠেলে সরিয়ে দিলেন শুক্লা দাসকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র গলায় বললেন, ‘মেয়ে পাচার? তুমি জানো কী বলছ? আমি নিজেই থানায় খোঁজ নিচ্ছি!’

‘এইসব করতে যায়েন না!’ শুক্লা দাসকে অবিচলিত দেখায়, ‘আমার সঙ্গে কী কী করসেন, তার ভিডিয়ো তোলা আসে আমার কাসে।’

‘ভিডিয়ো?’ হাঁ হয়ে যান নবেন্দু মল্লিক, ‘কোন ভিডিয়ো?’

‘ভুলে যান। আমরা শনিবার চলে যাই। তারপর পুলিশ আসুক। আপনার কোনও দায় থাকবে না।’ শুক্লা দাস আবার হাসিমুখে

এগিয়ে আসে। নবেন্দুর দুই কাঁধে হাত রেখে নরম গলায় বলে, 'আমরা বরং এই কয় দিন কোথাও ছুটি কাটাই। পাশের ঘরে যাবেন?'

'তোমাকে আমি খুন করব!' নবেন্দু দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁত চেপে বলেন কথাটা।

'কী যে বলেন!' শুক্লা দাস মুখ টিপে হেসে নিয়ে বলল, 'ভিডিয়ো দেখবেন একবার? ভালই শুটিং হইসে। একবার দেখেন। তারপর খুন করবেন!'

'আমাকে ব্ল্যাকমেল করছ? ধূপগুড়ির একটা রিটায়ার্ড পুলিশকে চমকে দেওয়ার কথা বলেছিলে সে দিন!'

'শুধু শনিবার দিন চলে যাওয়ার ব্যাপারে হেল্প করবেন।' শুক্লা দাস আঁচল দিয়ে মুখ মুছল— 'আপনি যা চাইসেন, দিসি। এবার আপনি একটু হেল্প করেন। আমি তো আপনারে আরও দিব। ধূপগুড়ির পুলিশটা আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ করসে। কিন্তু ওকে এখন আটকায়ে লাভ নাই। উপরমহল থিকা প্রেশার দিসে। পাশের ঘরে যাবেন?'

নবেন্দু মল্লিক দ্রুত চিন্তা করে নিলেন। কন্যাসাথির অফিসকে দেখে রাখার কথা বলেছিলেন একবার বুদ্ধ ব্যানার্জি। তিনি থাকতে পুলিশ এখানে রেড করবে, সেটা অসম্ভব। কিন্তু শুক্লা দাস তাঁকে ফাঁদে ফেলেছে। শরীরের টোপ দিয়ে টেনে এনে ভিডিয়ো তুলে রেখেছে কোন ফাঁকে! কিন্তু যেটা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এখনও হাতের বাইরে চলে যায়নি। তাই মাথা ঠান্ডা রাখাটাই কর্তব্য বলে ভেবে নিলেন তিনি।

'হেল্প করার পর কি ভিডিয়োগুলো মুছে ফেলবে তুমি?' ধীর গলায় জানতে চাইলেন নবেন্দু মল্লিক।

শুক্লা দাস কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আমি নিজে এসে আপনাকে ভিডিয়ো দিয়ে যাব। আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকেন, তবে আর ভিডিয়ো তোলার দরকার কী?'

'ঠিক আছে। আমি শনিবার রাতে সব ব্যবস্থা করে দেব।' নবেন্দু মল্লিক বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান। কিন্তু শুক্লা দাস দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে আশ্চর্য গলায় বলে, 'চলে যাচ্ছেন কেন? কথা তো হয়েই গেল। পাশের ঘরে চলেন এবার! আমি দুধ গরম করে রেখেছি ফ্লাস্কে।'

নবেন্দু মল্লিক দেখলেন যে শুক্লা দাসের মুখে কোনও অপরাধের চিহ্ন নেই। তার বুকের আঁচল গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তার কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম। নবেন্দু মল্লিক আবার নিজেকে ফিরে পেলেন এইসব দেখে।

'আপনার হেল্প আমার লাগবে।' শুক্লা দাস ফিসফিস করে বলে, 'আমি এই টিমে আর থাকব না। অন্য টিমে যাব।'

'তখনও কি আমাদের এইসব ভিডিয়ো করবে?' চুকচুক করে শুক্লা দাসকে চুমু খেয়ে জানতে চান নবেন্দু মল্লিক।

'আর করব না। প্রমিস!' আদুরে গলায় বলে শুক্লা দাস। তারপর গভীরভাবে নবেন্দুকে আলিঙ্গন করে গলে যাওয়া গলায় বলে, 'পাশের ঘরে চলো সোনা! আজকে সব স্পেশাল হবে!'

তা-ই হল। পাশের ঘরে শুক্লা দাসের শরীরে আবার আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন নবেন্দু মল্লিক। বুদ্ধ ব্যানার্জির উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শুক্লা দাসকে খনন করতে। চাপা শীৎকার ছড়িয়ে মিশে গেল শেষ বসন্তের বাতাসে।

৭৮

মুনমুন টোপ্পোকে ছেড়ে দেওয়ার পর ক্যাভেন্ডিস অনুমান করেছিলেন যে, সে যদি ফিরে গিয়ে কোনওভাবে সুরেশ কুমারকে খবর পাঠাতে পারে, তবে সে নিশ্চিত লোক লাগিয়ে দেবে। দীপকের লাশটা পাচার করে দেওয়ার পর তিনি গাড়ি নিয়ে এলাকা ছেড়ে বার হওয়ার সময় পিছু নেওয়া গাড়িটিকে লক্ষ করতে ভোলেননি। সুরেশ কুমারের লোক পিছু নিয়েছে বুঝতে পেরে তিনি ফোনে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়ে সোজা ঢুকে গিয়েছেন একটা দামি হোটেলে। এর মধ্যেই তাঁর লোক সুরেশ কুমারের লোককে ফলো করতে শুরু করেছিল একটা বাইকে চেপে। ক্যাভেন্ডিস নিশ্চিত যে, কাল সকালের মধ্যেই সুরেশ কুমারের ডেরার খোঁজ মিলে যাবে।

হোটেলটা বেশ দামি। ক্যাভেন্ডিস রাত কাটাবার জন্য একটা ঘর নিয়ে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ খুলে বসলেন। সুরেশ কুমারকে তিনি চাইলে আজই খুঁজে বার করতে পারতেন। মুনমুন মেয়েটাকে চাপ দিয়ে সহজেই বার করে নিতে পারতেন সব তথ্য। কিন্তু ক্যাভেন্ডিসের অত তাড়া নেই। তিনি যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে সেখানে দীপক নামের একটা ছেলেকে রেখেছিলেন— এই তথ্যটা সুরেশ কুমার পেল কীভাবে? সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে তিনি প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিলেন। এর মানে তৃতীয় কেউ খেলে যাচ্ছে আড়াল থেকে। এর বাইরে আরও একটা খবর তিনি জেনেছেন, যেটা বেশ ভাবার মতো। কোনও এক জঙ্গি গোষ্ঠীকে দিল্লি হাই এবং ডার্ক ক্যালকাটা— দু'তরফ থেকেই টাকা দেওয়া হয়েছে। সেটা কি পল অধিকারীর গোষ্ঠী? পল অধিকারীর পাত্তা লাগানোর জন্য দাসবাবুকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাঁর জায়গায় রঞ্জিতকে এনেছিলেন বুদ্ধ ব্যানার্জি। কিন্তু দাসবাবুর কাজের কোনও আপডেট নেই তাঁদের ডেটা ব্যাঙ্কে।

কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে ক্যাভেন্ডিস দিল্লি হাই-এর ওয়েবসাইটে ঢুকলেন। বিশ্বের কোনও সার্চ ইঞ্জিনে এই সাইট ধরা দেয় না। দলের কয়েকজন মাত্র এটা ব্যবহার করতে পারে। ক্যাভেন্ডিস সাইটে গিয়ে মুনমুন টোপ্পোকে খুঁজলেন। ফল পাওয়া গেল। দিল্লি হাই-এর ডুয়ার্স শাখার নারী পাচার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মুনমুন বাইরে কাজে যায়। মাসকয়েক আগে বিজু প্রসাদ তাকে ডুয়ার্সে পর্ন ভিডিয়োর কাজের জন্য মেয়ে খোঁজার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজু প্রসাদের মৃত্যুর পর তার আর কোনও আপডেট নেই।

ক্যাভেন্ডিস চিন্তা করতে লাগলেন। মুনমুন দলেরই মেয়ে হতে যাচ্ছিল। বিজু প্রসাদ মরে যাওয়ার ফলে সে সাময়িক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুরেশ কুমার সেই সুযোগে তাকে তুলে নিয়েছে। এটা হওয়ার অর্থ হল, বিজু মরে যাওয়ার পর তার ঠিক পরের লোকটিকে ঠিকমতো গাইড করা হয়নি। দাসবাবু এটা অনায়াসে করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। কারণ কী? তাঁকে কি নির্দেশ দেওয়া হয়নি? বুদ্ধ ব্যানার্জি কি ভুলে গিয়েছিলেন নির্দেশ দিতে?

'হতে পারে!' নিজের মনেই বললেন তিনি। এটা মাইনর মিসটেক। কিন্তু নবীন রাইকে দু'-দু'বার মারার চেষ্টা হয়েছে। ইনফর্মেশন লিক না হলে এটা যেমন হত না, তেমনই দ্বিতীয়বার হামলাকারীরা নবীন রাইয়ের ভবলীলা ইচ্ছে করলেই সাঙ্গ করে দিতে পারত। সেটা না করার কারণ কী? পর্ন ভিডিয়োর ব্যবসায় নামবে বলে সে লাইনের লোকদের তারা মারছে না?

ক্যাভেন্ডিস আবার সাইটে গিয়ে বিজু প্রসাদের আন্ডারে থাকা লোকটির নাম জানতে চাইলেন। এবার যে নাম ও ছবি বার হল, সেটা দেখে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। তার নাম শুক্লা দাস। কন্যাসাথি নামক একটা এনজিও সামনে রেখে এস.টি. মেয়েদের পাচার করে। তবে সেই যে কন্যাসাথির হেড, সেটা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

শুক্লা দাসেরও কোনও আপডেট নেই অনেকদিন ধরে।

ক্যাভেন্ডিস উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলেন। শুক্লা দাস বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ হল, তার নিচে থাকা পুরো সিস্টেমটা অভিভাবক হারিয়ে ফেলেছে! এটা বুদ্ধ ব্যানার্জির জানা নেই, তা অসম্ভব! শুক্লা দাস স্ট্রিমে নেই। তাহলে সে কোথায় এবং কী করছে? সে কি সুরেশ কুমারের দিকে ভিড়ে গিয়েছে?

ল্যাপটপ রেখে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়েন ক্যাভেন্ডিস। বুদ্ধ ব্যানার্জির এত ভুল হয় না। তাহলে কি তিনি এনার্জি পাচ্ছেন না? একবার ভাল করে কথা বলে নিতে হবে।

(ক্রমশ)

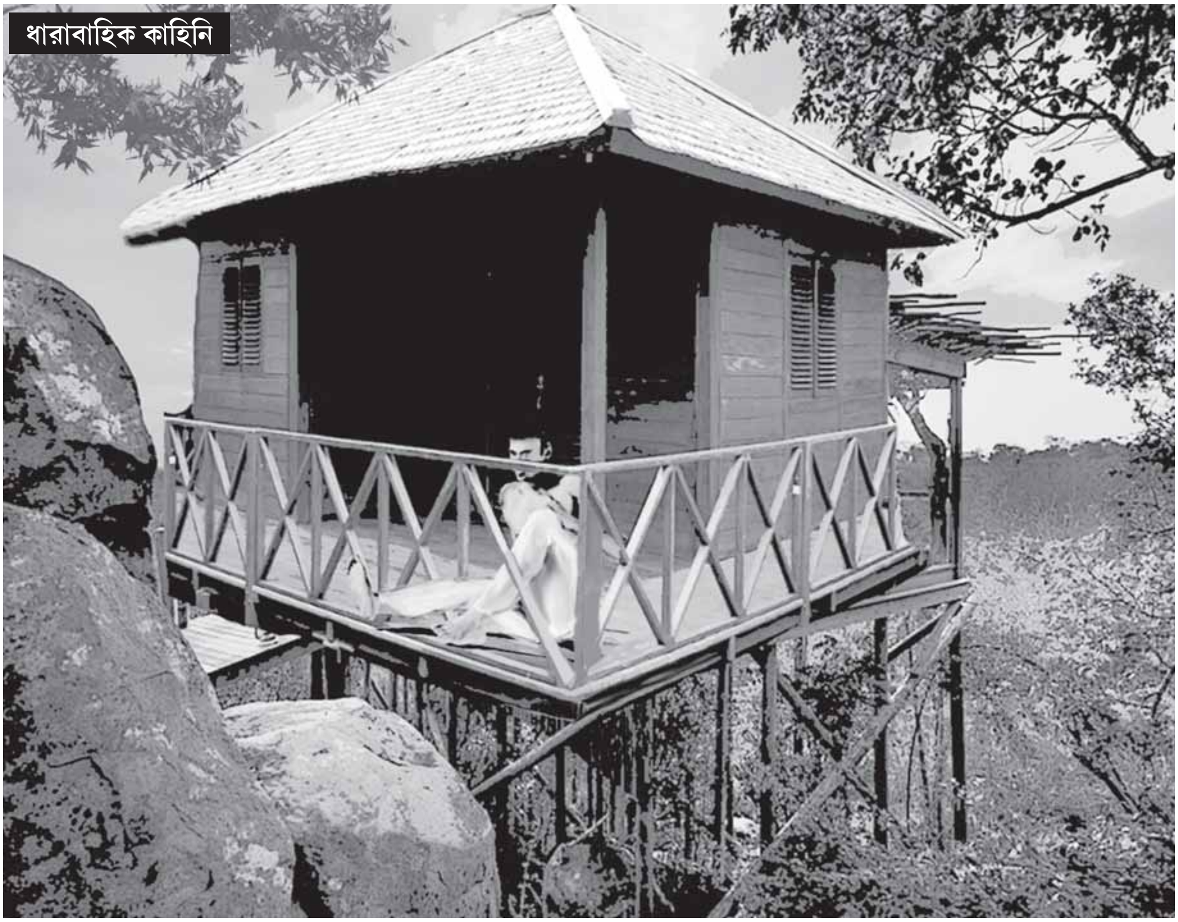

উৎরাই তরাই

।। ৪১ ।।

জঙ্গলের ধারে গাছ কেটে অনেকটা ফাঁকা জায়গা বার করে কাঠ চেরাইয়ের করাত এবং কাঠ রাখার কারবার। সামনের দিকে বারো ফুট উঁচু কাঠের খুঁটির মাথায় চারদিকে বারান্দা দেওয়া কাঠের তিন কামরার বাড়ি। হিদারু সেই বাড়ির পিছনের বারান্দায় পেতে রাখা বেঞ্চিটায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। তিনটি কামরার একটি স্টকরুম। একটায় মালিক নিজে থাকেন। অবশিষ্ট ঘরখানা হিদারু পেয়েছে। মালিক এখন নেই। কাল দুপুরের আগে আসবেন না। তবে লোকজন বেশ খাতিরযত্ন করে হিদারুকে আশ্বস্ত করেছে। এরা সকলেই কাঠ চেরাইয়ের কাজে যুক্ত। গোকুল নাগ নামের লোকটি একটু লেখাপড়াও জানে। হিদারু কাজের উদ্দেশ্যে এসেছে জেনে খুব খুশি হয়ে বলেছেন, 'আইসা কাজের কাজ করসেন! দাদা লোক ভাল। আপনারে পাইলে খুশি হইবেন। আমি থার্ড ক্লাসে উঠতে যায়া দুইবার ফেল মারসি। তারপর সাত জায়গায় সাকরি কইরে এহানে গাইড়্যা গেসি। ইনকাম খারাপ নাই ভাই।'

তারপর হাঁকডাক দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে হিদারুকে বারান্দায় স্নানের জল যেমন পাঠিয়ে দিয়েছে, তেমনই রান্না করিয়ে খাইয়ে দিয়েছে ভাত আর মাছের ঝোল। থাকার ঘর সাফসুতরো করিয়ে সন্ধের পর নিচে নামা কতটা বিপজ্জনক, সে বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে চলে গিয়েছেন। চলে যাওয়ার কারণ, বিকেল প্রায় গড়িয়ে আসছিল। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর হিদারু নিজের ঘরে চুপচাপ বসে ছিল খানিকক্ষণ। গতকাল বিকেলে বড়দিঘি চা-বাগানের কিছু আগে গুমরু প্রসাদের বাহিনীকে দেখতে পেয়েছিল হিদারুরা। তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সঙ্গীরা বিদায় নেয়। চা-বাগানের হাটে এসে যখন পৌঁছুল, তখন সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে। হিদারু আগে কখনও চা-বাগান দেখেনি। অন্ধকার হয়ে আসার কারণে চারপাশ ভাল দেখতে পারছিল না বলে ব্যাপারটা ভাবেইনি। হাটেই রাত কাটাতে হয়েছিল। গুমরু প্রসাদের লোক চটপট তাঁবু খাটিয়ে ফেলতেই হিদারু জিলিপি দিয়ে খানিকটা চিঁড়ে খেয়ে সোজা চলে গিয়েছে বিছানায়। তারপর সবকিছু ভাল করে ভাবতে চেষ্টা করেছিল চোখ বুজে। তারপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভেঙেছিল ভোরবেলায়। তাবু থেকে বাইরে বেরিয়ে হাট থেকে বেরিয়ে মাটির রাস্তা ধরে কয়েক পা এগতেই থমকে দাঁড়ায়। আকাশে বাদল মেঘের পাতলা স্তর বয়ে যাচ্ছিল। হিদারু সেই আকাশের তলায় দেখল, মাটির পথের দু'পাশে কে জানি বিছিয়ে দিয়েছে বিস্তীর্ণ সবুজ গালিচা। গালিচার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে গাছের দল। উড়ে যাওয়া একগুচ্ছ পাখি কলকল শব্দে ডেকে না গেলে হিদারু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত হয়ত আরও কিছুক্ষণ। সংবিৎ ফিরে পাওয়ায় সে বুঝল চা-বাগান দেখছে। এর পরে গুমরু প্রসাদের গাড়িতে চলতে শুরু করে চালসা পেরিয়ে গেল এক আশ্চর্য পথে। সে পথ পাহাড়ের বুকে ঢুকছে। হিদারুর চোখের সামনে ভেসে উঠছে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে এক অপরূপ জগৎ। পাহাড় চলে এসেছে হাতের কাছে। আবার একটু দূরে, কিংবা আরও দূরেও পাহাড়! বাঁক খেয়ে খেয়ে উঠছে রাস্তা পাহাড়ের দেয়ালের গা ঘেঁষে। আবার নামছেও। বিকেলের আগে আরও দুটো চায়ের বাগান পেরিয়ে একটা ছোট হাটে গুমরু নামিয়ে দিল হিদারুকে। টাউনে কোনও কোনও ছুটির দিন হিদারু দেখেছে, দল বেঁধে কালো রঙের লেবারের দল কাছের চা-বাগান থেকে এসেছে কেনাকাটার জন্য। তেমনই লোক ভরতি হাটে গুমরু প্রসাদ নামিয়ে দিল তাকে। সে এখানে থাকবে দুটো দিন। হাটের কাছাকাছি তিনটে বাগানে তার বেশ কিছু বাবু কাস্টমার আছে। তাঁদের মাল পৌঁছে তারপর আরও উপরের দিকে যাবে সে। তবে যাওয়া নির্ভর করবে বৃষ্টির উপর। একটা নদী টপকে যেতে হবে তাকে। বর্ষাকালে পাহাড়ি নদী পার হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

গুমরু প্রসাদ হাটের থেকে কাঠ চেরাইকলের এক লেবারকে খুঁজে বার করে হিদারুর সঙ্গে দিয়ে দিল। হাট থেকে ঘণ্টাখানেক হাঁটা-পথে সেই কল। সেই কালো লোকটি মহা উৎসাহে বাকিদের জোগাড় করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হিদারুকে। অগভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ ক্রমশ উতরাইয়ের দিকে চলে গিয়েছে। সেখানে হিদারু যখন পৌঁছাল, ততক্ষণে চেরাইকলের সবাই এসে হাজির। সব মিলিয়ে চোদ্দো-পনেরোজন। কিছুটা এগিয়ে গেলে ছোট একটা গ্রাম আছে। পাহাড়িদের গ্রাম। কাঠকলের লোকগুলো বেশির ভাগই সেই গ্রামের। দু'-তিনজন কালো লোক। গোকুল নাগই আলাদা। কিন্তু সবাইকেই বেশ মনে ধরেছে হিদারুর। লোকগুলো তাকে সম্মান করছে। পুলিশের নাকে ঘুসি মারার পর থেকে হিদারু এই একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বারবার টের পাচ্ছে। লোক সম্মান করছে তাকে। কাঠকলের লোকেরা

আকাশ ভারী হতে হতে একসময় বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়। তারপর মুষলধারায়। কাঠবাড়ির টিনের চালে আছড়ে পড়া জলের শব্দে ঝমঝম করতে লাগল চারদিক। কেরোসিন ল্যাম্পের দুর্বল আলোয় হিদারু শুধু দেখল, জলের কয়েকটা ধারা সশব্দে আছড়ে পড়ছে মাটিতে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেহে শীত ধরে যায়।

অবশ্য জানে না হিদারু কী কারণে এখানে এসেছে। কিন্তু এসেছে বলেই সম্মান পাচ্ছে হিদারু। সূর্য ডুবে গিয়েছে খানিকক্ষণ। গোধূলি নেমে আসছে হিদারুর চোখের সামনে। আলো জ্বালবার জন্য উঠল হিদারু। তার থাকার ঘরটি বেশ। আসবাব বলতে একটা তক্তপোশ, বিছানা, বালিশ। একটা টেবিল, কাঠের আলমারি, চেয়ার আর শেলফ। হিদারু কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালিয়ে হোল্ডঅলের জিনিসপত্র বার করে সাজিয়ে রাখতে শুরু করল। রাতে খাওয়ার জন্য ভাত আর মাছের ঝোল কেরোসিন স্টোভে গরম করে নিতে হবে। সকাল হলে গোকুল নাগ আসবেন সাইকেল নিয়ে। হিদারুর জন্য সকালের জলখাবার এবং দরকারি টুকিটাকি জিনিস এনে দেবেন তিনি।

খুদিদার দেওয়া পকেটঘড়িটা বার করে হিদারু দেখল সাড়ে ছ'টা। গোপাল ঘোষ তার অজ্ঞাতবাসের জন্য একটা কম্পাসও দিয়েছেন। হিদারু পরম যত্নে একটা করে জিনিস গুছিয়ে রাখতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পর কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল বারান্দায়। চারদিকে অসীম, হু হু অন্ধকার। ঘন মেঘে ভারী হয়ে থাকা আকাশের কারণে সে অন্ধকার জমাট বেঁধে নিশ্ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। গা ছমছম করে উঠল তার। এখন সে টের পাচ্ছে নিঃসঙ্গতা। জন্মের পর এই প্রথম একা থাকছে সে। এখানে কাজ করতে গেলে সবসময় যে একা থাকতে হবে, তেমন নয়। বেশির ভাগ দিন কলের মালিক থাকেন এখানে। গোকুল নাগের মুখে হিদারু জেনেছে যে, মালিকের ঘরে বেশ কিছু বইপত্র আছে। সপ্তাহে দু'দিন খবরের কাগজও আসে। বর্ষা কমে গেলে ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ হয় এই কলে। খদ্দের আসে। সুতরাং খুব একটা নিঃসঙ্গ কাটবে না। তবুও এই মুহূর্তে হিদারুর নিঃসঙ্গতা তীব্র। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে বাবার কথা। বাবা চলে যাওয়ার বেশ কয়েকদিন পর হিদারু হঠাৎ টের পেয়েছিল যে, সে খুব নিঃসঙ্গ।

আকাশ ভারী হতে হতে একসময় বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়। তারপর মুষলধারায়। কাঠবাড়ির টিনের চালে আছড়ে পড়া জলের শব্দে ঝমঝম করতে লাগল চারদিক। কেরোসিন ল্যাম্পের দুর্বল আলোয় হিদারু শুধু দেখল, জলের কয়েকটা ধারা সশব্দে আছড়ে পড়ছে মাটিতে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেহে শীত ধরে যায়। হিদারু চলে আসে নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে পড়ে চিৎ হয়ে। অবিশ্রান্ত ঝমঝম শব্দে ডুবে যেতে যেতে ভাবতে চেষ্টা করে অনেক কিছু। সময় কেটে যায়। ডুয়ার্সের বর্ষা তার যাবতীয় উচ্ছলতা, বিভঙ্গ, হিল্লোল, লাস্য, ছন্দ নিয়ে যেন জলের আলিঙ্গনে ভরিয়ে দিতে চায় প্রকৃতির শরীর।

একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে হিদারু। তারপর ভোর হয়। পাখি ডাকে অজস্র। ধারাপাত থামিয়ে কালো আকাশ থম মেরে বিশ্রাম নেয়। হিদারু ঘুম থেকে ওঠে। আধ ঘণ্টা পর দেখা যায়, সে নিচে নেমে এসে বাইরের মেটে রাস্তায় নিবিষ্ট মনে প্রকৃতির শোভা দেখছে। গোকুল নাগ বলেছিলেন সকাল সকাল চলে আসবেন। তাঁর সঙ্গে বাজারে যাবে হিদারু। একা থাকার ব্যাপারটা এখন সে বিশ্বাস করে ফেলেছে। বাজার থেকে টুকিটাকি জিনিস ছাড়াও কিছু খাম-পোস্টকার্ড কিনতে হবে। চিঠি লিখতে হবে খুদিদা, গোপাল ঘোষ, গগনেন্দ্রদাদাদের। খামে চিঠি লিখবে বউকে। একঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গিয়ে বসল সামনের গাছগুলোর ফাঁকে। রাস্তাটা কিছু দূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে আরেকটা চা-বাগানের দিকে। সেটা প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। সেদিকে পাহাড়ের মাথায় অন্ধকারের মতো মেঘ জমে আছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা তার নজরে এল একটা হাতি। প্রথমে তার কলজে চমকে উঠেছিল ধীর ছন্দে হেঁটে আসা অতিকায় জীবটিকে দেখে। তারপর তার পিঠে একটা মানুষ দেখে স্বস্তি হল। হাতির সওয়ারির পরনে সাহেবি পোশাক। পায়ে গামবুট। মাথায় শোলার টুপি। হিদারুর এবার মনে হল যে, তার আগমনের কথা জেনে গিয়ে নিশ্চয়ই কোনও সাহেব তাকে খুঁজতে আসছে। কিন্তু হাতিটা আরও কিছুটা এগিয়ে আসার পর হিদারু বুঝতে পারল সওয়ার কোনও সাহেব নয়। টুপির কারণে মুখটা বুঝতে না পারলেও লোকটিকে শত্রু বলে মনে হল না হিদারুর। সম্ভবত চা-বাগানের কর্মী। হিদারু শুনেছে,

ডুয়ার্সের বাগানে হাতিকে অনেক কাজে লাগানো হয়।

দশ-বারো হাত দূরে হাতিটা দাঁড়িয়ে গেল। তারপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটির উপর। লোকটি কিন্তু নামল না। হিদারু স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তার বুকে মৃদু ধুকপুকানি শুরু হয়ে গিয়েছে। এ লোক তার চেনা! কিন্তু এখানে সে কী করছে? হিদারুর খবর সে পেল কী করে? হিদারুর কোনও ভুল হচ্ছে না তো?

'চিনতে পারছ বঙ্কিম?'

না। আর কোনও ভুল নেই। হিদারু তীব্র আনন্দ আর উত্তেজনায় চিৎকার করে বলে উঠল, 'নিতাইদা! তুমি?'

'কে, নিতাই?' এক মুখ হাসি নিয়ে টুপিটা খুলে ফেলে সেই ব্যক্তি। এবারে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। সামান্য একটু মোটা হওয়া ছাড়া আর কিছুই বদলায়নি তার চেহারায়। সহজ ভঙ্গিতে হাতির পিঠ থেকে নেমে সে বলে, 'আমি তো এখন মুসলিম, বঙ্কিম। তোমার মনে নেই?'

হিদারুর মনে পড়ে গেল যে, নিতাই পালকে দত্তক নিয়েছিল নিঃসন্তান ইসমাইল।

'আমি এখন তাহের।' সে এগিয়ে আসে। পরম পুলকে জড়িয়ে ধরে হিদারুকে। গতকাল গুমর প্রসাদের সঙ্গে বাজারে হিদারুকে দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল সে। তারপর খোঁজ নিয়ে জানতে পারে হিদারুর ডেরা। জানার পর থেকে গোটা রাত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে সকালের জন্য। হিদারুকে এসব জানিয়ে দেওয়ার পর শুরু হয় তার প্রশ্নবাণ। হিদারু কিছু গোপন করে না। সব জানিয়ে দেয়। শুনে অবাক চোখে হিদারুর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

আর আমি অবাক হয়ে দেখি ডুয়ার্সের হরিদ্রাভ আত্মার হাসিমুখ। তিনি আমাকে কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'অবাক হলে তুমি? ভুলেই গিয়েছিলে নিতাই পালকে? ভেবেছিলে বুঝি উপেন আসছে, তা-ই না?'

আমি জানতে চাই, 'কোথায় উপেন?' তিনি কোনও জবাব দিলেন না। কেবল ইশারা করলেন কালচক্রের দিকে তাকিয়ে। চক্র ঘুরে গেল। আমি দেখলাম, ১৯৩৩ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহের একটা দিনে যখন নিতাই ওরফে তাহের আর হিদারু মুখোমুখি, তখন মাথাভাঙার বাড়িতে গগনেন্দ্র একটা চিঠি পড়ে উত্তেজিতভাবে ডাকছে, 'শোভা! শোভা!'

হিদারুর কাণ্ড জানিয়ে লম্বা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন গোপাল ঘোষ।

(ক্রমশ)

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

স্কেচ: দেবরাজ কর

ডুয়ার্সের নাট্যচর্চা হোঁচট খেল রবীশ্বর ভট্টাচার্যর মৃত্যুতে

একদিন এই পৃথিবী আর কিছুই থাকবে না।
শুধু এক অন্ধ অবস্থান, সেখানে শুধু
বিভ্রান্ত দিন আর রাত্রি ঘোরে
বিশাল আকাশের নিচে যেখানে ছিল আন্দিজ পর্বতমালা
সেখানে একটি পাহাড়ও নেই এমনকি একটা গিরিখাতও না।

ফরাসি কবি জুল সুপরভইয়ের লেখা কবিতার (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ) এই অংশটির পরই মনে আসে আন্তন চেখভের 'দ্য থ্রি সিস্টারস' নাটকের তিন বোন ওলগা, মাশা আর ইরিনার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ। মূল নাটক থেকে অনূদিত 'তিন বোন' নাটকে তাঁরা তিনজন হলেন সত্যবতী, শ্রীমতী ও যশোমতী। সংলাপগুলো এরকম—

—ও ভগবান,
সময় চলে যাবে,
আমরা মুছে যাব—
আমাদের মুখ, কণ্ঠস্বর
সব মুছে যাবে—

—স্টিমারের
ভোঁ, কেউ কেউ চলে
গেল, কেউ কেউ
জন্মের মতো হারিয়ে
গেল—

—শীত আসছে,
গাছের সমস্ত পাতাগুলো ঝরে যাবে কুয়াশায়
ঢেকে যাবে চারদিক—

প্রকৃতির উপর নিরন্তর অত্যাচার করে চলেছে মানুষ। নিজের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বেঁচে থাকা হয়ে উঠেছে সংশয়াকীর্ণ। ছয় সন্তানের জনক কবি তাই সম্ভবত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সন্তানরা এই সুন্দর পৃথিবীতে শ্বাস নিতে পারবে তো? কাজেই ফরাসি কবি সুপরভই কবিতাটি লিখেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অনুভূতি থেকে। চেখভ লিখেছিলেন অন্য পরিপ্রেক্ষিত থেকে। অলীক, ভ্রান্ত স্বপ্ন এই সময়ে আমাদের চারপাশে নিয়ত ক্রমবর্ধমান। বাড়ছে হিংসা, দ্বেষ। বাড়ছে অন্যের অনুভূতিকে বুঝতে না পারার ব্যাধি। তবুও চেখভ আর সুপরভই, দু'জনের লেখাতেই খুঁজে পাওয়া যায় মানবজাতির আজীবনের আত্মিক টানাপোড়েনের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। যে কোনও মহৎ সৃষ্টির এই এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আলাদা আলাদা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতিকে এক আঁচড়ে ছুঁতে পারা। ১৮৮০-৯০ সালের রাশিয়ার পরিবেশ, পরিমণ্ডল, চরিত্র এই সময়ে এসে বদলে গেলেও চেখভের এই নাটকের চরিত্ররা মানুষকে এখনও ভাবায়। আকর্ষণ করে।

নাট্যকলাকে যাঁরা কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন, ক্ষণকালেই তাঁদের সার্থকতা। ভাবীকালের জন্য তাঁরা কিছুই রেখে যেতে পারবেন না। এ যেন বহু যত্নে বহু ধৈর্য নিয়ে জলের উপর আলপনা আঁকা, যা মুছে যাবে একটু বাদেই। সাহিত্যিক বা চিত্রকর যেমন পরবর্তীকালে মূল্যায়ন পেতে পারেন, সংগীতও রেকর্ডের মাধ্যমে এখন সত্যিই ধরে রাখা সম্ভব। কিন্তু মঞ্চাভিনয় এমন এক বস্তু, যা প্রতিদিনের দর্শকের হৃদয়ের সঙ্গে অভিনেতৃবর্গের হৃদয়ে তান মিলিয়ে নিয়ে নতুন কিছু তৈরি করে। নতুন কোনও অনুভব। এই বিশেষ কিছুর টানেই তো নাটক দেখতে ছুটে আসে মানুষ। অন্ধকার মঞ্চে জাদু-আলোয় চেনা কলাকুশলী হয়ে ওঠে হঠাৎ করেই অচেনা।

ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বের নাম রবীশ্বর ভট্টাচার্য। বাইরের লোকের কাছে তিনি রবীশ্বরবাবু বা রাখালদা, কিন্তু আমার কাছে জেঠু। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, জেঠু হয় মোটা চশমা নাকের ডগায় নিয়ে এসে কিছু লিখছেন খসখস করে, নয়ত মোটা মোটা বইয়ে মুখ গুঁজে বসে আছেন অথবা অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবছেন। হাতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট ফুরিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে নিজের অজান্তে। চেখভের 'দ্য থ্রি সিস্টারস' নাটকটি বড় প্রিয় ছিল তাঁর।

জেঠু ছিলেন বান্ধব নাট্যসমাজের প্রাণপুরুষ। ছোট ভাই বরুণকাকুকে নিয়ে

এসেছিলেন নাটকের আঙিনায়। দু'জন নাটকের লোক থাকায় বাড়িতে সারাদিনই নাটক নিয়ে কথা হত। কোনও বিশেষ চরিত্রের কোনও বিশেষ সংলাপ কী করে বলতে হবে, সেটা অফিস যাবার সময় ভাত খেতে খেতে কাকাকে দেখিয়ে দিতেন জেঠু। সে এক মজার কাণ্ড। কাকুর কিছুতেই সংলাপ বলাটা রপ্ত হচ্ছে না, এদিকে জেঠুও ছাড়বেন না। এঁটো হাত শুকিয়ে যেত খাবার পাতে।

সারা বছর ধরেই কোনও না কোনও নাটকের মহড়া চলত। ছেঁড়া তমসুক, দুর্যোধন, ত্রিংশ শতাব্দী, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, ক্যাপ্টেন হুররা, রাজদর্শন... দুরন্ত সব নাটক। সে সময় রেডিয়ো বা গল্প-উপন্যাস ছাড়া বিনোদনের অন্য কোনও উপকরণ ছিল না। ফলে নাটকের হল দর্শকে ঠাসা থাকত। কদমতলা দুর্গা পুজো প্রাঙ্গণ ছিল অনেকটা জায়গা নিয়ে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর রাতে সেখানে আলাদা আলাদা নাটক হত। দর্শকরাও মুখিয়ে থাকতেন নতুন নাটক দেখার জন্য। ফলে মহোৎসাহে মহড়া চলত তার আগের দু'মাস ধরে। নির্দেশনা ও প্রযোজনা করতেন জেঠু। প্রয়োজনে লিখেছেনও কিছু। অভিনয়ও করেছেন কখনও কখনও। ছোটবেলা থেকেই এসব নানারকম মজার কাণ্ডকারখানা দেখে এসেছি বলে ওই আলো-আঁধারি মঞ্চ, জাদু-আলো, আশ্চর্য সব প্রপস, শব্দসংযোজনার ম্যাজিক, কস্টিউম পরে মেকআপ নিয়ে চেনা কলাকুশলীদের বদলে যাওয়া রূপ দেখে এক আশ্চর্য কুহক টান অনুভব করেছি নাটকের প্রতি।

নিজের ভাবনা অন্য মানুষের মধ্যে চারিয়ে দেবার জন্য অনেক মাধ্যম আছে। তাহলে নাটক কেন? জেঠু বলতেন, থিয়েটার আমাদের হাসায়, কাঁদায়, আনন্দ দেয়। পাশাপাশি ভাবায়, সচেতন করে। শিক্ষিতও করে। নাটকের মতো সমাজসংস্কারক জিনিস আর কিছু হয় না। যাঁরা নাটক করেন, তাঁরা চেষ্টা করেন বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে বিশ্ব থিয়েটারের পরম্পরা রচনা করার। তবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, ইদানীং অনেক নাটক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সঠিক অর্থে নাটকের প্রসার হচ্ছে না। নাটক তার ব্যাপকতা হারাচ্ছে। নাটক মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। সকলে একত্রিত হয়ে আন্দোলন গড়ে না তুলতে পারলে নাটক এগবে না।

'মার্চেন্ট অব ভেনিস' থেকে 'কিং লিয়র', 'আ মিডসামার নাইট'স ড্রিম' থেকে 'ওথেলো'— শেকসপিয়রের সঙ্গে আমার পরিচয় বাংলা ভাষায়। সে সময় চমৎকার কিছু অনুবাদের বই পাওয়া যেত আমাদের মফস্‌সল শহরে। জেঠু ফি-মাসে দু'-তিনটে

রবীশ্বর ভট্টাচার্য

রাজানুগ্রহে কোনও ভাল থিয়েটার হতে পারে না। সেই থিয়েটার হয় খণ্ডিত। কালের দর্পণ হয়ে ওঠে না কিছুতেই। সঠিক সত্য বিম্বিত হয় না সেই থিয়েটারে।

বই কিনে দিতেন আমাকে। প্রসেনিয়ম থিয়েটার কাকে বলে কিংবা ব্রেখটের নাটক ঠিক কী, সেসব সম্বন্ধেও আমি জেঠুর কাছ থেকে জেনে ফেলেছি মাধ্যমিক দেবার বহু আগে থেকে।

ডাকাবুকো স্বভাবের মানুষ ছিলেন জেঠু। আদর্শ ব্যায়ামাগারের প্রাণপুরুষদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। ইংরেজি লিখতেন চমৎকার। কবিতা লেখার শখ ছিল। একটি কবিতার বইও লিখেছিলেন ইংরেজিতে। নিজে বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। মার্কস, এঙ্গেলসের দর্শন কিংবা ভারতের রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বলে যাওয়ার মতো পড়াশোনা ছিল। একচালা বাড়ির চুনকাম খসে যাওয়া ভাঙা দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ঝুলত চে গ্যেভারার ছবি। সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন সামনে থেকে। নিজের স্বার্থের কথা কখনও ভাবেননি। ছয় ও সাতের দশকের রক্ত-ঝরা সময়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, চা-বাগানে গিয়ে থেকেছেন দিনের পর দিন। পরের দিকে নেতৃত্বের কিয়দংশের স্খলন দেখে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু রক্তিম পতাকার উন্মীলনের স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

একটা কথা জেঠু সবসময় বলতেন। মানুষ বড় দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সেই দুর্দশার অবসানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের শান্তিকামী, প্রতিবাদী নাট্যকর্মীরা সাহসী পদক্ষেপে মিছিলে পা মেলাক। রাষ্ট্রশক্তির কৃপা-অকৃপার পরোয়া না করে বুক চিতিয়ে লড়াই করুক। মাথা উঁচু করে কাজ করার একমাত্র স্পেস হল থিয়েটার। নাটক অমিত শক্তিধর এক অস্ত্র। তার সঠিক প্রয়োগ রাষ্ট্রশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। রাজানুগ্রহে কোনও ভাল থিয়েটার হতে পারে না। সেই থিয়েটার হয় খণ্ডিত। কালের দর্পণ হয়ে ওঠে না কিছুতেই। সঠিক সত্য বিম্বিত হয় না সেই থিয়েটারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দেশে দেশে, কালে কালে শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের ফসলগুলো ফলেছে সংকটের মধ্যেই। সে কারণেই 'নীলদর্পণ', 'রক্তকরবী', 'টিনের তলোয়ার'-এর কথা ভুলবে না মানুষ।

আগামী ২৭ মার্চ হল বিশ্ব নাট্য দিবস। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট বা আইটিআই হল এর উদ্যোক্তা। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম ১৯৪৮ সালে। ভারত এর সদস্যপদ গ্রহণ করে ১৯৫০ সালে। বাংলাদেশ স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে ১৯৮৯ সালে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব হয়। সেখানে সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চার সংগ্রামী ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় চিন, জাপান, কোরিয়া, নেপাল ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থনে। এই বিশেষ দিনটি পালন করা হয় এই আশা নিয়ে যে, থিয়েটারকর্মীরা পুনরায় আবিষ্কার করবেন নাটকের শক্তিকে। দিনটি উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে নাট্যশিল্পীরা নিজেদের সৃজনীশক্তিকে বুঝে নিতে চাইবেন। এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষে মানুষে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। জেঠু বলতেন, বিশ্ব নাট্য দিবস শুধুমাত্র থিয়েটারকর্মীদের জন্যই নয়, থিয়েটার দর্শকদের জন্যও উৎসর্গীকৃত। নাটকে নাট্যকার, অভিনেতা ও দর্শক মিলিতভাবে একটা সম্মিলিত শক্তি হয়ে ওঠে। সেই সম্মিলিত শক্তি এক বিস্ফোরক শক্তির সৃষ্টি করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জেঠু পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। আমি জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, প্রারব্ধ মানি। জেঠু মানতেন না। আমার কথায় হো হো করে হাসতেন। অশীতিপর মানুষটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন জানুয়ারি মাসের ১৯ তারিখে। সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছিল। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। ২৯ তারিখ ভোররাতে নিবে গেল তাঁর জীবনদীপ। এই নিরহংকারী, সৎ, খাঁটি ভদ্রলোকটি চলে গেলেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে। একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ডুয়ার্সের নাট্যচর্চা ব্যাহত হল তাঁর মৃত্যুতে।

কম্পাস-এর ২৫ বছরের নাট্যোৎসবে তারকাদের সমাবেশ

কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে সদ্য সমাপ্ত হল নাট্যোৎসব। এ বছর কম্পাস-এর রজতজয়ন্তী বর্ষ। সে কারণে ৩ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ১০ দিন ধরে চলা নাট্য উৎসবে ছিল তারকার সমাবেশ— সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, দেবশংকর হালদার, আশিস বিদ্যার্থীর উজ্জ্বল উপস্থিতি দর্শকদের

অভিভূত করেছে। ফলশ্রুতি, কোচবিহারের নাট্যপ্রেমী দর্শকরা দেখলেন কিছু অসাধারণ নাটক। প্রদীপ জ্বালিয়ে কম্পাস নাট্যোৎসবের উদ্‌বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা নাট্যকার ব্রাত্য বসু। এই নাট্যোৎসবের দৌলতে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নাট্যদলগুলোর অসাধারণ কিছু প্রযোজনা দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য হল কোচবিহারবাসীর। কলকাতা থেকে আসা প্রযোজনা সংস্থাগুলোর মধ্যে আভাষ-এর 'চতুষ্কোণ', অন্তর্মুখ-এর 'আমেরিকা

আবিষ্কার', বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন-এর 'কমলা', ইছাপুরের আলেয়া প্রযোজিত 'ই-মানবিক' দর্শকদের নজর কেড়েছে। নিউ দিল্লি বোস স্টুডিয়ো প্রযোজনা করল শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ'। বিহার থেকে আসা ফ্যাক্ট-এর নাটক ছিল 'গাওয়ার ঘিচার'। বহরমপুরের রঙ্গাশ্রম প্রযোজিত তৃতীয় লিঙ্গদের নিয়ে করা নাটক 'সন্তাপ' এক কথায় অসাধারণ। আসাম থেকে এসেছিল দুটো দল। উইংস থিয়েটার প্রযোজনা করল 'হেলেন'। আর দাপুন-এর প্রযোজনা ছিল সৌমিত্র-কন্যা পৌলোমী বসু নির্দেশিত মুখোমুখি কলকাতা প্রযোজিত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'ফেরা' এবং মুম্বইয়ের একজুট প্রযোজিত, নাদিরা বব্বর নির্দেশিত, আশিস বিদ্যার্থী অভিনীত নাটক 'দয়াশংকর কি ডায়েরি'। গত এক বছর ধরে এই নাট্যমেলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁরা, জানালেন কম্পাস-এর অন্যতম নির্দেশক দেবব্রত আচার্য। জানালেন, চাকরি করতে হয় পেটের তাগিদে। আর নাটকের জন্য বেঁচে থাকা। ১৯৯২ সালের ১২ এপ্রিল যার সূচনা হয়েছিল, আজ দেখতে দেখতে ২৫টা বছর পার হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে এখন ২২ জন। নাট্যমেলায় নিজেদের প্রযোজিত নাটকও ছিল। এবারের নাট্যোৎসবে বাজেট ছিল ১০ লক্ষ টাকা। কিছু এসেছে বিজ্ঞাপন থেকে, সামান্য টাকা উঠেছে টিকিট বিক্রি করে, সংস্কৃতিমন্ত্রক থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য, বাকিটা ধার করতে হয়েছে বলে জানালেন তিনি। বললেন, প্রত্যেক বছর আমরা ১২ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে এক হাজার টাকা করে কম্পাস স্কলারশিপ দিয়ে থাকি। এ বছরও দিয়েছি। এ ছাড়াও এবারও বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে কোচবিহারের ভাওয়াইয়া শিল্পী সুনীতি রায়কে। কম্পাস সম্মাননা দেওয়া হয় বহরমপুর রবীন্দ্রসদনের কর্মী শ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, বহরমপুর নাট্যচর্চায় যাঁর অবদান অনস্বীকার্য। আর আসামের পবিত্র রাভাকে— নাট্যক্ষেত্রে

ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার এই প্রাক্তনীর বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হয় এই বিশেষ সম্মান। দেবব্রতবাবু স্বপ্ন দেখেন সেই দিনের, যে দিন নাটক করে মানুষ উপার্জন করতে পারবে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর তকমা ঘুচে যাবে নাট্যকর্মীদের। কম্পাসের এই স্বপ্ন পূর্ণ হোক, তারা আরও ভাল নাটক উপহার দিক কোচবিহারের দর্শকদের, যাতে নাটকের দিকে নতুন প্রজন্মেরও আগ্রহ জন্মায়।

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

নাট্যমেলা

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে এবং দিনহাটা পুরসভার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল ১৬তম নাট্যমেলা। দিনহাটা নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতিসদনে ২৭ জানুয়ারি থেকে ছয় দিনের এই নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায় ডাকুয়া। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, রাজ্য নাট্য আকাদেমির সচিব দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক উদয়ন গুহ, দিনহাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সাধন কর প্রমুখ।

ছয় দিনের এই নাট্যমেলায় ছ'টি নাট্যদল নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রথম দিন কলকাতার বালিগঞ্জ ব্রাত্যজন নাটক পরিবেশন করেন। পিয়ালী বসু চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তাদের নাটক ছিল 'কমলা'। বিজয় তেন্ডুলকরের গল্প নিয়ে নাটকটি রচিত। মহিলাদের উপরে পুরুষসমাজের চিরাচরিত নির্যাতন এবং তাদেরকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নাটকের মূলকথা। দু'ঘণ্টায় পরিবেশন না করে নাটকের দৈর্ঘ্য কমানো যেত। তবে বিজয় মুখার্জি ও পিয়ালী বসু চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে নাটকটি উতরে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দিন পরিবেশিত হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার ইউনিভার্সিটি মালঞ্চর নাটক 'নটী বিনোদিনী'। এ নাটকে নটী বিনোদিনী চরিত্রের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে গিরিশ ঘোষের চরিত্রটি। বিনোদিনী চরিত্রে আরও সাবলীল অভিনেত্রীর দরকার ছিল। এখানে পরিচালক ও অভিনেতা দেবাশিস সরকার (গিরিশ) অনবদ্য অভিনয় করেছেন।

তৃতীয় দিন পরিবেশিত হয়েছে অন্য থিয়েটার নাট্যদলের নাটক 'নটী কিরণশশী'। রাজা ওয়াদিবাসের ছায়াকিরণে এই নাটকটি পুরাণ ও ইতিহাসের ছোট ছোট ঘটনাকে নিয়ে নির্মিত। এই নাটক বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় অন্য মাত্রা পেয়েছে। কিরণশশীর ভূমিকায় সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় এবং ভুবনবাবুর চরিত্রে শ্যামল চক্রবর্তীর অভিনয় অনবদ্য। এ নাটকে আলো, আবহ এবং মঞ্চের কাজ বাংলা থিয়েটারকে এক নতুন দিগন্ত দেখিয়েছে।

চতুর্থ দিন মঞ্চস্থ হয় সায়ক নাট্যদলের নাটক 'পাসিং শো'। জীবনযাত্রার মূলকথা শিকড়, সেই শিকড়টাই যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সবই মিথ্যে। সেই পুরনো এবং আদি জিনিসকে ধরে রাখতে যে মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থলাভের জন্য তাকে আমরা 'পাগল' বা 'অন্ধ' মনে করি। পুরনো কোনও কিছুই হারিয়ে যায় না— এটাই সর্বকালীন সত্য। বাংলা থিয়েটার বর্তমানে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা 'পাসিং শো' না দেখলে বোঝা যেত না।

পঞ্চম দিন মঞ্চস্থ হয়েছে কালিন্দী ব্রাত্যজন-এর নাটক 'গ্যাং'। পরশুরামের গল্প অবলম্বনে এই নাটক। জ্যোতিষের নামে বর্তমান সমাজের ধান্দাবাজদের গল্প নিয়ে এই নাটক। মোটামুটি হয়েছে। কিছু পলিয়োগ্রাফি ছাড়া আর কিছু দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি।

১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ নাট্যমেলার শেষ দিন অভিনীত হয়েছে কলকাতার রংরূপ নাট্যদলের নাটক 'তখন বিকেল'। রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মানুষের জীবনের পড়ন্ত বিকেলে হারিয়ে যাওয়া সোনালি দিনগুলোর স্বপ্ন এবং তার থেকে উত্তরণ— এই ধারণাকে মঞ্চে জীবন্ত করে তুলেছেন নির্দেশক সীমা মুখোপাধ্যায়। সীমাদেবী বর্তমানে বাংলা থিয়েটারে একজন অন্যতম নির্দেশক। তিনি তাঁর অভিনয়ে এবং নির্দেশনায় দর্শক-মনে প্রবেশ করতে পেরেছেন। 'তখন বিকেল'-এর আর-এক অভিনেতা বিমল চক্রবর্তীর অভিনয়ও সমৃদ্ধ করেছে এ নাটকটিকে। টানা প্রায় দু'ঘণ্টা বিমল চক্রবর্তী ও সীমা মুখোপাধ্যায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শককে।

হরিপদ রায়

সোনাপুর নেস্ট চিলড্রেন মডেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সোনাপুর নেস্ট চিলড্রেন মডেল স্কুলের (সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার, স্থাপিত ২০১৫) দ্বিতীয় বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি।

বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্‌বোধক মহঃ সৈকত আলি (অধ্যক্ষ, পীযূষকান্তি মহাবিদ্যালয়), প্রধান অতিথি অশোক ভট্টাচার্য (অধ্যক্ষ, উত্তরবঙ্গ চারুকলা মহাবিদ্যালয়), বিশেষ অতিথি সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন কবি, শিল্পী, শিক্ষক, সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠিত হয়েছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতা, সেই সঙ্গে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল নৃত্য, সংগীত ও নাটকে। নাটক 'নব অঙ্কুর', রচনা জগন্নাথ মোহন্ত, নির্দেশনা রিজ সাহা। ভীষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে শেষ হল দু'দিনের এই আনন্দযজ্ঞ, প্রাপ্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার প্রস্ফুটন। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ সকল শুভানুধ্যায়ী, অতিথি, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও শিক্ষার্থীকে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নারী পাচারের বিরুদ্ধে পথনাটক 'মরণফাঁদ'

সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার প্যারেড গ্রাউন্ডে হয়ে গেল দশ দিনব্যাপী 'বিশ্ব বাংলা ডুয়ার্স উৎসব'। এই বিশ্ব বাংলা ডুয়ার্স উৎসব প্রাঙ্গণে আলিপুরদুয়ার লিগাল সার্ভিস অথরিটির সৌজন্যে কমিটির চেয়ারম্যান তথা অতিরিক্ত জেলা জজ মাননীয় অশোককুমার পালের তত্ত্বাবধানে হয়ে গেল একটি সমাজসচেতনতামূলক পথনাটক। পথনাটকটি পরিবেশন করে বর্তমানে বাংলার নাটকের ইতিহাসে স্থান করে নেওয়া নাট্যদল আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থা। সিন্টু দত্ত রচিত ও নির্দেশিত পথনাটক 'মরণফাঁদ' উৎসব প্রাঙ্গণে আগত মানুষদের ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সিন্টু দত্ত খুব সহজ-সরল একটি গল্পের মধ্যে দিয়ে নারী পাচার তথা মানুষ পাচারের ভয়ংকর ঘটনাগুলো তুলে ধরেন। এক অসুস্থ ছেলে ও এক স্কুলে পাঠরতা মেয়েকে নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বাবা ও মায়ের সংসার। পরিবারের আর্থিক অচলতার জন্য মেয়ে ময়না ভীষণভাবে

উদ্‌বিগ্ন। পাশাপাশি ময়নার বন্ধু তারকও কাজের জন্য দিশেহারা। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে গ্রামে এসে উপস্থিত হয় অ্যান্টনি নামে এক আগন্তুক। সে নিজেকে পরিচয় দেয় সিনেমামেকার হিসাবে। সিনেমায় সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে এবং কাজের লোভ দেখিয়ে ময়না ও তারককে নিয়ে যায় ওই আগন্তুক। কিছুদিন পরে তারকের কিডনিহীন দেহ পাওয়া যায় এবং ময়নার কোনও হদিশই পাওয়া যায় না। সমাজকে এই ভয়ংকর বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই এই 'মরণফাঁদ' নাটক বারবার উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন গ্রামেগঞ্জে, বস্তিতে বস্তিতে। সেই কাজটিই করছে আলিপুরদুয়ার লিগাল সার্ভিস অথরিটি এবং সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থা। অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করেন পরিতোষ সাহা (বাবা), শাশ্বতী দত্ত (মা), তনুশ্রী সাহা (ময়না), রিজু সাহা (তারক), জয় মোহন্ত (সূত্রধার ও সমাজসেবক) এবং আগন্তুক সিন্টু দত্ত। একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন সুদীপ্ত মুখার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমাজের বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে বিনা পয়সায় আইনি পরিষেবার আহ্বান জানান মহকুমা বিচারবিভাগীয় দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মাননীয় ধ্রুবজ্যোতি ভট্টাচার্য এবং আইনি পরিষেবা সমিতির সম্পাদক বিজ্ঞান বসু মহাশয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি

সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান উদীচীর

'লখনউ বেঙ্গলি ক্লাব ও যুব সংস্থা'র আয়োজনে প্রতি বছর লখনউতে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বছরও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২২টি নাট্যদল, যাদের মধ্যে জলপাইগুড়ি উদীচী নাট্যসংস্থা অন্যতম। বলা যায় বিশেষভাবে অন্যতম, কেননা এই প্রতিযোগিতায় ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করে সসম্মানে জলপাইগুড়ি ফিরে এসেছে উদীচী। এই গৌরবে গৌরবান্বিত সমগ্র জলপাইগুড়িসহ ডুয়ার্স ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাও। এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব পুরস্কার উদীচীর ঝুলিতে জমা হয়েছে, সেগুলি হল 'দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক' অভিজিৎ নাগ, এবং 'প্রথম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী' ডালিয়া চৌধুরী। তবে সমগ্র প্রযোজনায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার ক্ষেত্রে দলের সমস্ত কলাকুশলীর সবাই সমান অংশীদার। এ এক নিঃসন্দেহে আনন্দের ব্যাপার, জলশহর যে নাটক অন্ত প্রাণ এবং উদীচীর 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকের মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় স্থান পাওয়া নেহাত কম কথা নয়। স্যালুট জলপাইগুড়ি, স্যালুট উদীচী।

রঙ্গন রায়

মালবাজারে কিশলয় শিশু বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি মালবাজারের কলোনি ময়দানে অনুষ্ঠিত হল কিশলয় শিশু বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম দিন ছিল কিশলয়ের কচিকাঁচাদের অনুষ্ঠান। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা গান, কবিতা, নাচ এবং নাটকে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে মাতিয়ে দিয়েছিল। কিশলয়ের কর্ণধার মীনাক্ষী ঘোষ নিজেও উত্তরবঙ্গের একজন পরিচিত বাচিক শিল্পী হওয়ায় এই শিশু বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশিত অনুষ্ঠানের মধ্যেও সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রকাশ দেখতে পেলাম।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন কবি, আবৃত্তিকার ও নাট্যশিল্পী দেবেশ ঠাকুর এবং সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য।

দেবেশ ঠাকুর তাঁর অনুষ্ঠানকে দু'টি পর্বে ভাগ করেছিলেন। প্রথম পর্বে তিনি পরিবেশন করেন আবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক কবি, একের পর এক কবিতার আবৃত্তিতে তাঁর অসামান্য পরিবেশনা দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। এমনিতেই তাঁর কণ্ঠস্বরটি ঈশ্বরের দান। আবৃত্তিলোকে সেই কণ্ঠস্বরের

অনায়াস যাতায়াত, ওঠাপড়া, বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতোই প্রত্যেকটি কবিতাকে কিশলয়ের মঞ্চে উপস্থাপিত করেছিল।

দ্বিতীয় পর্বে তিনি পরিবেশন করেন একক অভিনয় 'শেষ সংলাপ'। কবি মধুসূদন দত্তর জীবনের শেষ দিনগুলিকে নিয়ে দেবেশ ঠাকুর রচিত এবং নির্দেশিত এই নাটকটির অভিনয় মালবাজারবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের জন্য স্থান করে নিয়েছে। মধুসূদনের শেষ জীবনের ভয়ংকর দারিদ্র, অসহায়তা, স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি ভালবাসা, অনুশোচনা, না-পাওয়ার যন্ত্রণা, সর্বোপরি এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আকাংক্ষা মাত্র আধ ঘণ্টার এই নাটকে যেভাবে মূর্ত হয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। আবহও নাটকটিকে রসোত্তীর্ণ হতে যোগ্য সংগত করেছে। দুই পর্বের মাঝে সংগীত পরিবেশন করেন মণিকা ঠাকুর।

দেবেশ ঠাকুরের অসামান্য অনুষ্ঠানের আমেজকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়েই মঞ্চে আসেন এ যুগের অন্যতম সেরা বাংলা গানের শিল্পী মনোনয়ন ভট্টাচার্য। বলতে দ্বিধা নেই, তিনি তাঁর ভূমিকাতে একশো শতাংশ সফল। কখনও রবীন্দ্রসংগীত, কখনও নজরুলগীতি, কখনও নিজের অ্যালবামের গান কিংবা পুরনো দিনের বাংলা গান— যে গানই মনোময় গেয়েছেন, হাজারখানেক শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। এই দিনের অনুষ্ঠানের শ্রোতৃবৃন্দকেও ধন্যবাদ দিতে হয় মনোময়ের কাছ থেকে সেরাটুকু আদায় করে নেবার জন্য। কারণ, কে না জানে, ভাল গান শুনতে হলে ভাল শ্রোতাও প্রয়োজন, যাদের উৎসাহে শিল্পী তার আবেগের সবটুকু উজাড় করে গাইবে। মনোময়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দুই আমন্ত্রিত শিল্পীর অনুষ্ঠানের আগে সমবেত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শ্রুতি ও সুরবীণার শিল্পীবৃন্দ, এবং একক সংগীত পরিবেশন করেন গৌরব সূত্রধর। বহুদিন পর মালবাজারের বুকে আবৃত্তি, অভিনয় এবং বাংলা গানের এমন ত্রিবেণী সংগম উপহার দেবার জন্য কিশলয়কে অভিনন্দন।

সুধাংশু বিশ্বাস

তিস্তা উদ্যানে ফুলমেলায় মন মাতানো আবহ তৈরি হল এবার

বসন্তের আমন্ত্রণবার্তা নিয়ে গত ৪-৫ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির তিস্তা উদ্যান প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল ২৪তম বার্ষিক পুষ্পমেলা। উদ্যান ও কানন (উত্তর) বিভাগ, বন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত এই পুষ্পমেলা দু'দিনব্যাপী পুষ্পপ্রদর্শনী ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ভিড় টেনে নেয়। ৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ উদ্‌বোধনের দিন হাজির ছিলেন বন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মণ, অতিরিক্ত জেলাশাসক ডঃ বিশ্বনাথসহ আরও বিশিষ্টজন। বনপাল সুধীরচন্দ্র দাসের স্বাগত ভাষণের পর আদিবাসী নৃত্য সহযোগে আগতদের বরণ করে নেওয়া হয়। এ ছাড়াও সেখানে প্যারেড প্রদর্শন করে জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ।

এ বছর এই মেলায় পুষ্পপ্রদর্শনের পাশাপাশি যোগ করা হয়েছে সবজিকেও। মোট ৫১টি বিষয়ে পুষ্প ও সবজি প্রতিযোগিতা তার শাখা বিস্তার করে, যেখানে ছিল বিজয়ীদের জন্য মোট ১৫৬টি পুরস্কার। এ ছাড়াও এবার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি থেকে একজন করে বনকর্মীকে তাঁর সারা বছরের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। ফুলমেলার সঙ্গে সঙ্গে এবার তিস্তা উদ্যানে সংযোজন করা হয় নতুন আকর্ষণ 'ওয়াটার ওয়াকিং বল অ্যান্ড অ্যাকোরিয়াম'। দু'দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভরে ছিল উদ্যান। মোট ৫১টি দল থেকে প্রায় শ'তিনেক শিল্পী অনুষ্ঠান করেন এই দু'দিনে। এবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হিসেবে ছিলেন বিশ্বনাথ দাস, তিনি মাথায় ২৩টি হাঁড়ি নিয়ে নিপুণ দক্ষতায় তাঁর

কলাকৃতি প্রদর্শন করে বিস্মিত করেন দর্শকদের। নাচ, গান, আবৃত্তি, কুইজ নিয়ে জমজমাট মেলায় এত দর্শক আগে কখনও দেখা যায়নি— এমনই আলোচনা চলেছে সকলের মধ্যে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার গুরুদায়িত্বটি সুন্দরভাবে সামলে তোলেন জলপাইগুড়ির অভিজ্ঞ সঞ্চালক মানস ভৌমিক, যিনি দূরদর্শনে সঞ্চালনার কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন অত্যন্ত সাবলীলভাবে।

এ বছরের ফুলমেলা ফুলের আগুন লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগামী বছরের আশার মধ্যেই যেন জানিয়ে গেল, ‘বসন্ত সমাগত’।

গ্রন্থন সেনগুপ্ত

থার্ড আইয়ের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব কোচবিহার সাগরদিঘি স্কোয়্যার শাখার উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এ বছরও হয়ে গেল আলোকচিত্র প্রদর্শনী। সরস্বতী পুজো উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় স্টেট ব্যাঙ্ক কোচবিহার শাখার ‘লালা দীনদয়াল’ কক্ষে। প্রদর্শনীতে সাদা-কালো, রঙিন ও প্রকৃতি— মোট তিনটি বিভাগ ছিল। তিনটি বিভাগ মিলিয়ে প্রদর্শনীতে মোট ২৬৯টি ছবি স্থান পেয়েছিল। এটি থার্ড আই-এর ২৭তম প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। এখানে বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন কলকাতার তিনজন নামকরা আলোকচিত্রী— প্রবীরকুমার রায়, ডঃ দেবদাস ভুঁইয়া ও নূপুরকুমার রায়। প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন কোচবিহার সদর মহকুমাশাসক অরুন্ধতী রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার বি টি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মলয়রঞ্জন সরকার। প্রদর্শনীতে দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেড়াতে চলুন আন্দামান

গ্রুপ টুর
যাত্রা শুরু
২১ মে ২০১৭
(পোর্ট ব্লেয়ার থেকে পোর্ট ব্লেয়ার)
আসন সীমিত

৭ রাত ৮ দিনের প্যাকেজ টুর		
পোর্ট ব্লেয়ার	-	৪ রাত
হ্যাভলক	-	২ রাত
নীল	-	১ রাত

প্যাকেজ রেট
১৭,৮৫০ টাকা (জন প্রতি)
১৬,৯০০ টাকা (তৃতীয় ব্যক্তি)
১৪,৩০০ টাকা (৫-১১ বছর)
৮,৯০০ টাকা (২-৪ বছর)
(দ্রষ্টব্য: বিমান ভাড়া ব্যতীত প্যাকেজ রেট)

প্যাকেজ খরচের অন্তর্গত
সাইট সিইং, পরিবার প্রতি ঘর, নন-এসি গাড়ি, খাওয়া (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার), সরকারি বোট, সকল পারমিট

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
HOLiDAYAAR
Siliguri Office: Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri 734001 Ph: 0353-2527028, +91 9002772928
Cooch-Behar Office: Ph: +91 9434042969
Jalpaiguri Office: Addaghar, Mukta Bhaban, Merchant Road Jalpaiguri 735101 Ph: 03561-222117, 9434442866

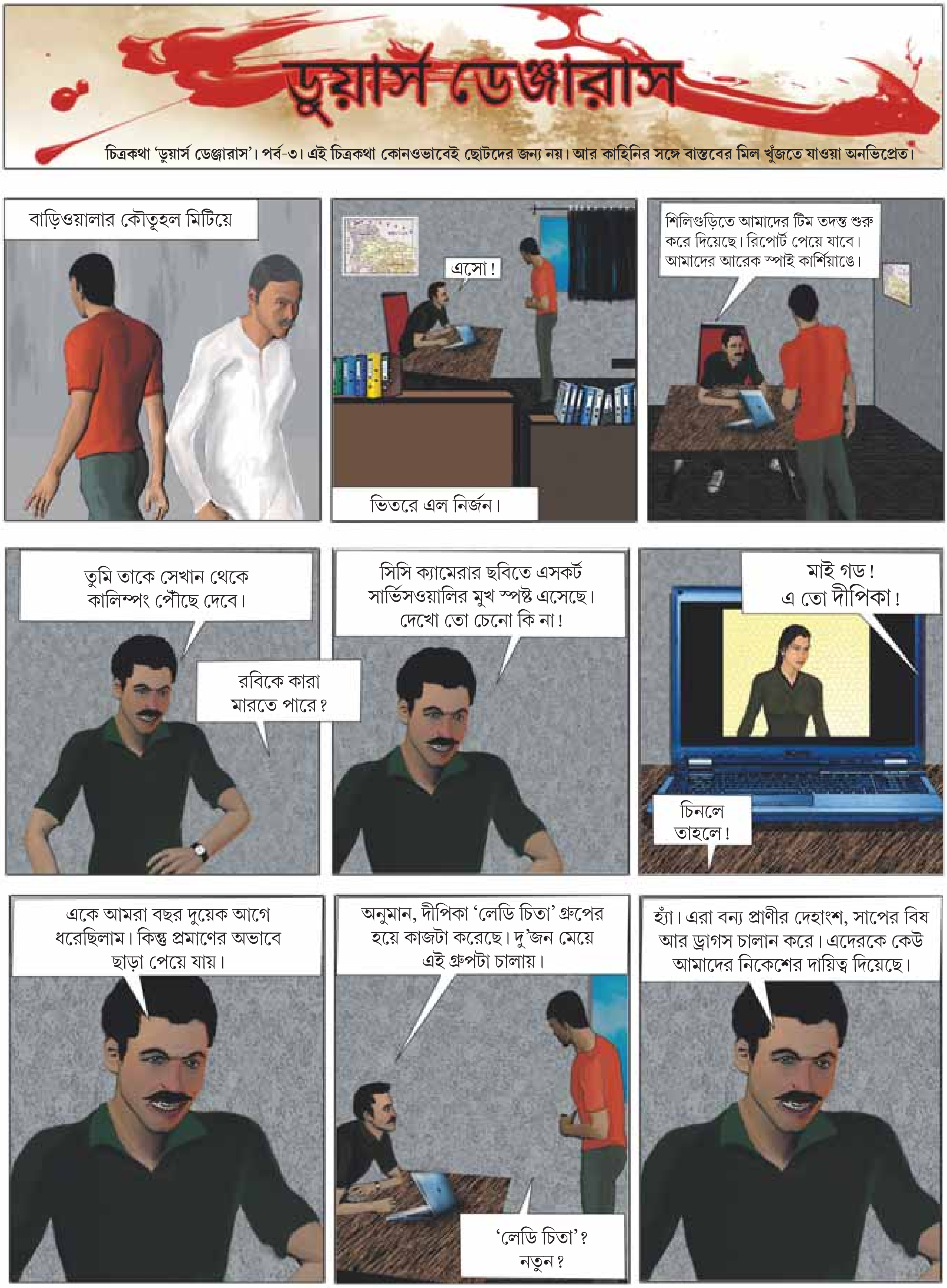
ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস
চিত্রকথা 'ডুয়ার্স ডেঞ্জারাস'। পর্ব-৩। এই চিত্রকথা কোনওভাবেই ছোটদের জন্য নয়। আর কাহিনির সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজতে যাওয়া অনভিপ্রেত।
বাড়িওয়ালার কৌতূহল মিটিয়ে
এসো!
ভিতরে এল নির্জন।
শিলিগুড়িতে আমাদের টিম তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। রিপোর্ট পেয়ে যাবে। আমাদের আরেক স্পাই কার্শিয়াঙে।
তুমি তাকে সেখান থেকে কালিম্পং পৌঁছে দেবে।
রবিকে কারা মারতে পারে?
সিসি ক্যামেরার ছবিতে এসকর্ট সার্ভিসওয়ালির মুখ স্পষ্ট এসেছে। দেখো তো চেনো কি না!
মাই গড! এ তো দীপিকা!
চিনলে তাহলে!
একে আমরা বছর দুয়েক আগে ধরেছিলাম। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়।
অনুমান, দীপিকা 'লেডি চিতা' গ্রুপের হয়ে কাজটা করেছে। দু'জন মেয়ে এই গ্রুপটা চালায়।
'লেডি চিতা'? নতুন?
হ্যাঁ। এরা বন্য প্রাণীর দেহাংশ, সাপের বিষ আর ড্রাগস চালান করে। এদেরকে কেউ আমাদের নিকেশের দায়িত্ব দিয়েছে।

EKHON DUARS, Vol-3, Issue-11/1 WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

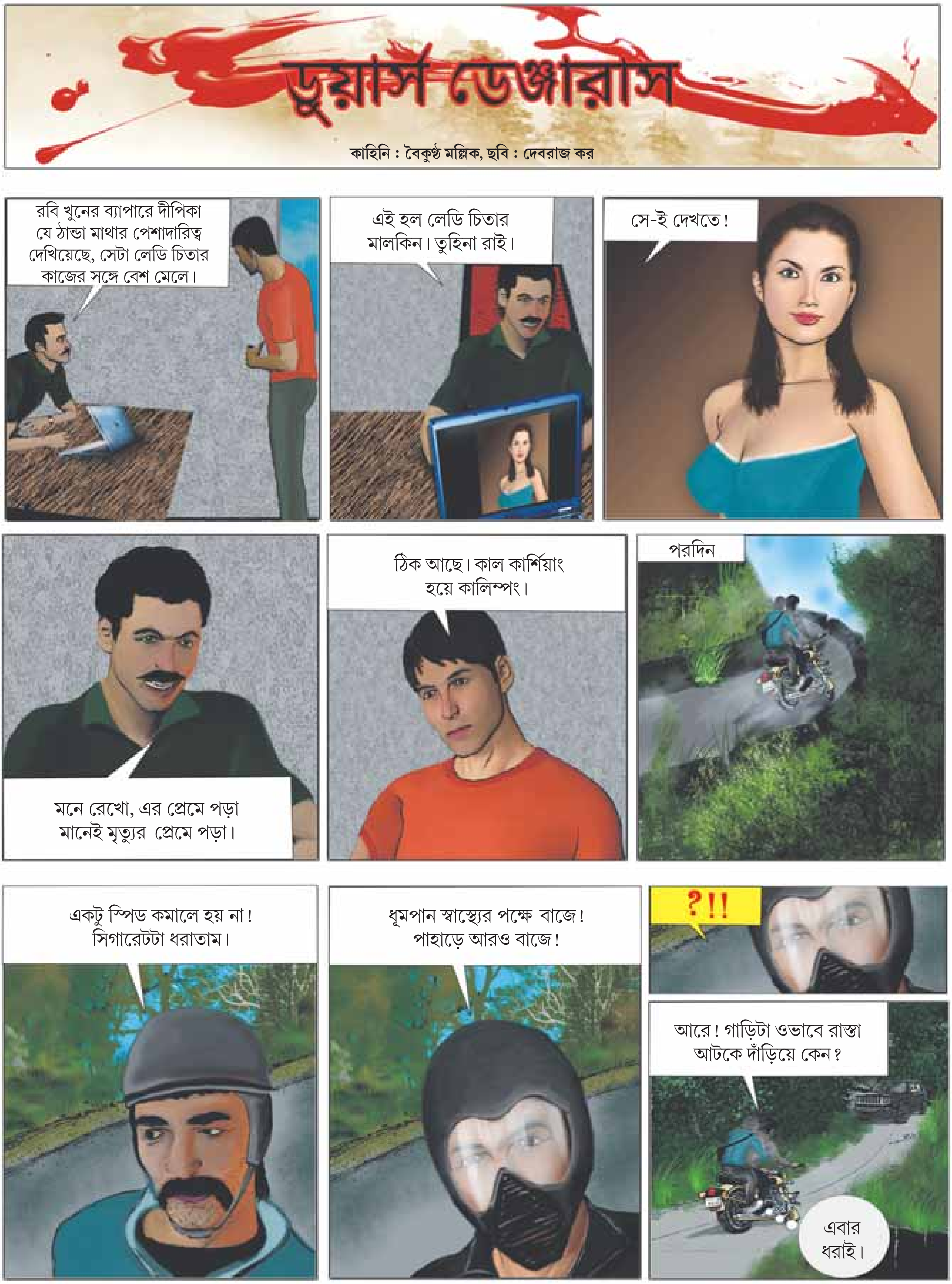

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.